জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-২ (নব পর্যায়)

মশা বাহিত কয়েকটি মারাত্মক রোগ

ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জাপানি এনকেফেলাইটিস ও জিকা

সংকলন ও সম্পাদনা

অরণি সেন ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন’ উদ্যোগ

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-২ (নব পর্যায়)

মশা বাহিত কয়েকটি মারাত্মক রোগ

ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জাপানি এনকেফেলাইটিস ও জিকা

সংকলন ও সম্পাদনা

অরণি সেন ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

Janaswasthya Bulletin 2 (Naba Parjay)
On Malaria, Dengue, Japanese Encephalitis
and Zika

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

গ্রন্থসত্ত্ব : সীমা রায়

প্রকাশনা : অরণি সেন
'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন'
৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

পরিবেশনা : অসিত দাস ও সুমন্ত বিশ্বাস
'উবুদশ', ৮এ নবীন পাল লেন। কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন: ৯৪৩৩৮১৯১০৩, ৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

প্রচ্ছদ ও বর্ণসংস্থাপন : রাজু রায়

মুদ্রণ : শরৎ ইম্প্রেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

যোগাযোগ : ssunnayan@gmail.com
www.ssu.2011.com

সংগ্রহ : ৬০ টাকা

উৎসর্গ

ডাঃ অমিয় কুমার হাটি
ডাঃ অমিতাভ নন্দী
ডাঃ সুভাষ চন্দ্র হাজরা

সূ চি প ত্র

ম্যালেরিয়া: এখনও নিয়ন্ত্রণ এলো না	অনল আচার্য	৭
কিভাবে হয় ডেঙ্গু?	স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে অবশ্য পালনীয়	—গৌতম মৃধা	২১
ডেঙ্গু জ্বর	সঞ্জয় সেনগুপ্ত	২৩
ডেঙ্গু নিয়ে দু-চার কথা	সব্যসাচী রায়	২৭
ডেঙ্গু নিয়ে এতো চিন্তার কারণ কি?	—অভিমন্যু তরফদার	৩০
উত্তরবঙ্গে অজানা জ্বরের অজানা কাহিনী	—গৌতম মৃধা	৩৫
এনকেফেলাইটিস ও শিশু মৃত্যু এবং তার থেকে বাঁচার উপায়	—স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮
Sankhabela (Saddened Twilight)	Sidhartha Mondal	৪৪
AES and the death of our children	Tirthankar Thakur	৪৬
মশক বাহিনী ও জিকা কাহিনী	সমীর রক্ষিত	৪৮
The message from the National Center for Vector Borne Diseases Control	—Tinu Jain	৫১

সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলি প্রতিনিয়ত নিজেদের পরিবর্তন করে চলায় কোন একটি ওষুধ বা টিকার সাহায্যে তাদের অনেককে নিষ্ক্রিয় করা গেলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এর সমাধানে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা ও প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। যার ফলশ্রুতি ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে WHO অনুমোদিত কিছু প্রার্থী টিকা (Candidate vaccines) আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও এদের ব্যবহার এখনও সীমিত।

- ডেঙ্গুর প্রার্থী টিকা : ২০১৫তে 'সানোফি পাস্তুর' ওষুধ প্রস্তুত সংস্থা তৈরি করে CYD-TDV। ২০২৩এ জাপানি ওষুধ প্রস্তুত সংস্থা 'তাকেদা' আনল QDENGA টিকা।
- ম্যালেরিয়ার প্রার্থী টিকা : RTS, S এবং R 21/Matrix-M।

কয়েকটি পতঙ্গ বাহিত রোগ

রোগ	জীবাণু	বাহক
• ম্যালেরিয়া	প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, মালেরি প্রভৃতি (প্রোটোজোয়া)	অ্যানোফিলিস মশা
• ডেঙ্গু	আরবো ভাইরাস	এডিস মশা
• জাপানি এনকেফেলাইটিস	ফ্ল্যাভি ভাইরাস	কিউলেক্স মশা
• জিকা	ফ্ল্যাভি ভাইরাস	এডিস মশা
• ইয়েলো ফিভার	আরবো ভাইরাস	এডিস মশা
• কালাজ্বর	লিসম্যানিয়া ডোনোভ্যনি (প্রোটোজোয়া)	স্যান্ড ফ্লাই
• ফাইলেরিয়াসিস	ইউচেরিয়া, ব্রুগিয়া জাতীয় গোলকৃমি	কিউলেক্স মশা ম্যানসোনিয়া মশা
• চিকুনগুনিয়া	আরবো ভাইরাস	এডিস মশা
• কিয়াসানুর ফরেষ্ট ডিজিজ	টোগাভাইরাস	এঁটুল পোকা
• ওয়েস্ট নাইল ফিভার	আরবো ভাইরাস	কিউলেক্স মশা
• ট্রিপ্যানো-সোমিয়াসিস	প্রোটোজোয়া	সেটসি ফ্লাই
• চাগাস	প্রোটোজোয়া	ট্রায়াটোম বাগ
• রিকেটসিয়া, তুলারেমিয়া	ব্যাকটেরিয়া	নানাধরনের টিক
• প্লেগ	ব্যাকটেরিয়া	র‍্যাট ফ্লি
• টাইফাস	ব্যাকটেরিয়া	এক ধরনের উকুন
• সিসটোসোমিয়াসিস	কৃমি	শামুক

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে 'National Center for Vector Borne Diseases Control' (১) ম্যালেরিয়া, (২) ডেঙ্গু, (৩) জাপানি এনকেফেলাইটিস, (৪) কালাজ্বর ও (৫) ফাইলেরিয়াসিস পাঁচটি মশা ও স্যাণ্ড ফ্লাই বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে 'National Vector Borne Diseases Control Programme' কর্মসূচি সারা দেশে পালন করে।

ম্যালেরিয়া : এখনও নিয়ন্ত্রণ এলো না

অনল আচার্য

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্মসূচিগুলির দিকে চোখ বোলালেই লেখাটির শিরোনামের তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।

- ১৯৪৭-১৯৫৩ : সামগ্রিক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি
  [সেইসময় সাড়ে সাত কোটি ম্যালেরিয়া রোগী এবং বছরে আট লক্ষ মৃত্যু হিসাব করা হয়েছিল।]
- ১৯৫৩ : জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (NMCP)
- ১৯৫৮ : জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ কর্মসূচি (NMEP)
  [১৯৬৫তে সরকারি ঘোষণায় দেশে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা এক লক্ষে নেমে আসে। অন্যদিকে কর্মসূচিকে শিথিল করে দেওয়া, বড় বাঁধ দিয়ে বড় জলাধার, খাল, বিভিন্ন নির্মাণের ফলে ঐ সমস্ত স্থির জলের আধারগুলি মশার প্রজননের মুক্তাঞ্চল হয়ে যায়। ১৯৭০ থেকে রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৫ লক্ষ হয়ে যায়।]
- ১৯৭১ : Urban Malaria Scheme.
- ১৯৭৭ : Modified Plan of Operation
- ১৯৯৭ : Enhanced Malaria Control Project (EMCP)
  [বিশ্ব ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত। এরপর থেকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য পশ্চিমের দাতা সংস্থাগুলি জাতীয় কর্মসূচিগুলিতে যুক্ত থাকে।]
- ১৯৯৯ : জাতীয় ম্যালেরিয়া বিরোধী কর্মসূচি (NAMP)
- ২০০২ : জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (NVBDCP)
- ২০০৫ : সহযোগী আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রবর্তিত Intensified Malaria Conrol Project (IMCP)
- ২০০৫ : NVBDCP জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের (NRHM) অন্তর্ভূক্ত হয়।
  [একে একে কর্মসূচিতে Rapid Diagnostic পরীক্ষা, ACT ওষুধ, পতঙ্গঘাতী রসায়ন মাখানো LLIN মশারি ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত হয়।]
- ২০০৮ : জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (NMC Project)
- ২০১০ ও ২০১৩ : নিউ ড্রাগ পলিসি ২০১০ ও ২০১৩ তৈরি করা হল
- ২০১৬ : National Strategic Plan for Malaria Elimination in India

- ২০১৭-২০২২ : National Stratagic Plan for Malaria Elimination in India (NSPME)
- ২০২২-২০৩০ : NSPME কর্মসূচির সম্প্রসারণ।

এছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) Roll Back Malaria, MDG, SDG প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কর্মসূচির উল্লেখই করলাম না।

কেন ম্যালেরিয়া এত ভয়ঙ্কর?

ম্যালেরিয়া বাহক (Vector) অ্যানোফিলিস মশা ২ মিলিগ্রাম ওজনের একটি ক্ষুদ্র সন্ধিপদী পতঙ্গ (Arthropod Insect) যা প্রকৃতির মধ্যে প্রায় ২৩ কোটি বছর ধরে রয়েছে এবং সামান্য স্থির জলে বা বৃষ্টি জমা জলে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। ম্যালেরিয়ার পরজীবী (Parasite) জীবাণু (Protozoa) খুব ক্ষুদ্রাকৃতি এবং মানুষ ও মশার দেহে চক্রাকারে থেকে যায়। সংক্রমিত মশার একটি কামড়েই ম্যালেরিয়া হতে পারে এবং দ্রুত ও সঠিক চিকিৎসা না করলে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া মস্তিষ্কের মারণ ম্যালেরিয়া (Cerebral & Malignant Malaria) হয়ে মৃত্যু ঘটায়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম চিকিৎসা, অসমাপ্ত চিকিৎসা এবং আংশিক ও অযৌক্তিক ওষুধ প্রয়োগের ফলে সহনশীল ম্যালেরিয়া (Common Drug Resistant Malaria) প্রজাতির জীবাণু জন্মলাভ করে, যা প্রচলিত চিকিৎসায় সাড়ে না, মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়।

ম্যালেরিয়া রোগী

WHO-র একটি হিসাবে ২০২০তে বিশ্বের ৮৫টি প্রাদুর্ভাব প্রবণ (Endemic) দেশে ২৪ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এবং ৬ লক্ষ ১৭ হাজার মানুষের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় (Tropical and Subtropical) অঞ্চলে বিশেষত আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ ও

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক ভয়াবহ ম্যালেরিয়া মহামারি (Epidemic) চলছে যাতে বেশি আক্রান্ত শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী, অপুষ্ট, অপ্রতিরোধী (Immuno Compromised) ব্যক্তিরা এবং জনজাতি, পরিযায়ী শ্রমিক ও ভ্রমণকারীরা।

ম্যালেরিয়া সাধারণত মা থেকে সন্তানে সংক্রমিত হয় না, কিন্তু সংক্রমিত রক্ত সঞ্চালন (Blood Transfusion) বা কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষাগারে দুর্ঘটনাবশত সংক্রমিত রক্তের খোঁচাতে (prick) হতে পারে। ম্যালেরিয়ার সাধারণ সংক্রমণ পথ (Portal of entry) **সংক্রমিত স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়**। পরিসংখ্যান কমিয়ে দেখানোর অভিযোগের মধ্যেও ভারতে দেখা গেছে ২২ শতাংশ অধিবাসী উচ্চ সংক্রামক এলাকায় (এক হাজার জনসংখ্যায় একের বেশির রোগী) বাস করেন এবং ৯১ শতাংশ রোগী ও ৯৯ শতাংশ মৃত্যু উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এবং ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও কর্ণাটক ১৭টি রাজ্যে ঘটে। নভেম্বর ২০২০ অবধি পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে ভারতে দুই লক্ষ রোগী যার মধ্যে ৪৬ শতাংশ ফ্যালসিপেরাম আক্রান্ত।

মহামারিবিদ্যার (Epidemiology) দিক থেকে ভারতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ জনজাতি ম্যালেরিয়া (Tribal Malaria), অরণ্যের ম্যালেরিয়া (Forest Malaria), শহরের ম্যালেরিয়া (Urban Malaria), বন্যাজনিত ম্যালেরিয়া (Flood related Malaria) প্রভৃতি ভাগে ভাগ করেছেন।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু, প্রজাতি ও তাদের জীবনচক্র

ম্যালেরিয়ার জীবাণু অনেক রকমের আছে। তারমধ্যে আমাদের দেশে মূলত দেখা যায় চার রকমের ম্যালেরিয়ার জীবাণু। (১) প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম, (২) প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, (৩) প্লাসমোডিয়াম ওভেল ও (৪) প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি। এর মধ্যে আমাদের দেশে ও রাজ্যে প্রথম দু'ধরনেরই ম্যালেরিয়া সাধারণত দেখা যায়। তাই আমরা ঐ দুটি প্রজাতির জীবাণু সংক্রান্ত আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবো।

সাধারণত রাতে মানুষের রক্ত খাওয়ার সময় সংক্রমিত মশা মানুষের দেহে স্পোরোজয়েট (Sporozoites) নিক্ষেপ করে যা রক্তসংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের যকৃতে পৌঁছে যকৃতের কোষগুলিকে সংক্রমিত করে। এখানে যে মেরোজয়েটগুলি (Merozoites) তৈরি হয় তা আবার রক্তসংবহনতন্ত্রে লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে সিজন্ট (Schizonts) তৈরি করে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে রোগের সৃষ্টি করে। এভাবে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুদের অযৌন জীবনচক্র (Asexual Cycle) সম্পন্ন হয়। সবশেষে সেক্সুয়াল গ্যামেটোসাইটস (Sexual Gametocytes) তৈরি হয়। যা

কোন অসংক্রমিত মশার কামড়ের ফলে সেই মশার দেহে প্রবেশ করে যৌন জীবন চক্র (Sexual Cycle) সম্পন্ন করে। ঐ সংক্রমিত মশা অসংক্রমিত কোন মানুষকে কামড়ালে সে ম্যালেরিয়ায় সংক্রমিত হয়।

সিজন্ট ভেঙ্গে গ্যামেটোসাইটস নির্গতর সময় মানুষের জ্বর শুরু হয়। মানুষের দেহে দুদিন এবং মশার শরীরে সাত থেকে ২০ দিন লাগে জীবাণুর সম্পূর্ণ চক্র সমাপ্ত হতে।

ম্যালেরিয়া থেকে যাওয়া, বারবার হওয়া, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ

ফ্যালসিপেরামের ক্ষেত্রে অনেক সময় অসমাপ্ত (Incomplete) ও অপর্যাপ্ত (Suboptimal) চিকিৎসার জন্য ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তকণিকার মধ্যে থেকে গিয়ে অসুস্থতা রয়ে যায় (Recrudescence)। আবার ভাইভ্যাক্স ও ওভেল ম্যালেরিয়ার জীবাণুর ক্ষেত্রে যকৃতে নিষ্ক্রিয় লিভার হিপনোজাইটস (Hypnozites) থেকে গিয়ে পরে সক্রিয় হয়ে মাঝে মাঝেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয় (Relapse)। কোন কোন প্রাদুর্ভাবপূর্ণ অঞ্চলে বারবার ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ হয়ে কিছুটা প্রতিরোধ (Partial Immunity) গড়ে ওঠে যার ফলে পুনরায় ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ হলেও প্রকোপ কম হয়। কিন্তু ছোট বাচ্চা ও গর্ভবতীরা রোগ থেকে অব্যবহতি পান না।

ম্যালেরিয়ার বাহক অ্যানোফিলিস মশা

আমাদের দেশে অ্যানোফিলিস কিউলিসিফেসিস (Anopheles Culicifacies) মশা ম্যালেরিয়ার প্রধান বাহক। এছাড়াও অ্যানোফিলিস-স্টিফেনশি (A.stephensi) (শহর ও শিল্পাঞ্চলে), ফ্লুভিয়াটিলিস (A.fluviatilis) (পাহাড় অরণ্যে), মিনিমাস (A.minimus) (তরাই, ডুয়ার্সে), ডাইরাস (A.dirus) (উত্তর পূর্বাঞ্চলে),

অ্যানোফিলিস মশা

এপিরোটিকাস (A.epiroticus) (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে) প্রভৃতি প্রজাতি দেখা যায়। সাধারণত স্থির জলে হলেও কেউ কেউ প্রবহমান জলে, নোনা জলে, কেউ কেউ বহুতলের ট্যাঙ্কে ডিম পাড়তে পছন্দ করে। মশাদের জীবনচক্রে ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ মশা চারটি স্তর থাকে। লার্ভা স্তরে মশা নিয়ন্ত্রণ সবচাইতে কার্যকর। পুদুচেরিতে ভারত সরকারের পতঙ্গ গবেষণা কেন্দ্র (VCRC) রয়েছে।

ম্যালেরিয়ার মশারা সাধারণ ১৫০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী পর্যায়ে যখন জল জমার বিষয়টি থাকে তখন (জুলাই থেকে নভেম্বর) ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি হয়। ২০-৩০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় ৬০ শতাংশ আদ্রতায় মশার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বিশ্বজুড়ে উষ্ণায়নের (Global Warming) কারণে মশা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়েই চলেছে। বেশি বৃষ্টি ও বন্যায় প্রথমে মশাদের প্রজনন স্থান ধুয়ে গেলেও পরে জমা জলে প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। মশাদের খাদ্যের ক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দের বিষয় আছে। কোন মশা মানুষের রক্ত খায় (Anthropophilic), কোন মশা কেবল পশুদের রক্ত খায় (Zoophilic)। আবার কোন ক্ষেত্রে পশু ও মানুষ উভয়ের রক্ত খেতে পারে।

ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান উপসর্গ ও লক্ষণ

প্রধান উপসর্গ (Symptoms)

(১) মাথা ব্যাথা
(২) গা ব্যাথা
(৩) দুর্বলতা
(৪) ঠাণ্ডা লাগা
(৫) কাঁপুনি দিয়ে প্রবল জ্বর (প্রথমে মাঝে মাঝে আসে, নিজে থেকে ঘাম দিয়ে ছাড়ে। ঠিকমত চিকিৎসা শুরু না হলে দু-তিন দিন পর থেকে টানা জ্বর শুরু হয়।)
(৬) গ্রন্থিগুলিতে ব্যাথা
(৭) কাশি
(৮) বুকে ও পেটে ব্যাথা
(৯) ক্ষুধামান্দ্য
(১০) বমি ভাব
(১১) বমি
(১২) ডায়রিয়া

প্রধান লক্ষণ (Signs)

(১) শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি
(২) রক্তাল্পতা
(৩) জণ্ডিস
(৪) প্লিহার বৃদ্ধি
(৫) যকৃতের বৃদ্ধি
(৬) লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া
(৭) দেহে লালচে দাগ

সেরিব্রাল বা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান উপসর্গ ও লক্ষণ
(Cerebral or Malignant Malaria)

উপসর্গ (Symptoms)

(১) প্রবল জ্বর
(২) খিচুঁনি বা কনভালসন
(৩) অজ্ঞান হয়ে পড়া
(৪) কোমা বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া
(৫) শ্বাসকষ্ট হতে পারে
(৬) শক ও দেহস্থ প্রধান অঙ্গগুলি বিকল হয়ে যাওয়া
(৭) কালো মূত্র হতে পারে
(৮) মেটাবলিক এসিডোসিসের লক্ষণ

লক্ষণ (Signs)

(১) প্রবল রক্তাল্পতা
(২) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে ক্ষতি
(৩) ফুসফুসে জল
(৪) রক্তচাপ কমে যাওয়া
(৫) শরীরের শর্করা কমে যাওয়া
(৬) নিউমোনিয়া
(৭) জন্ডিস
(৮) প্লিহা ও যকৃতের বৃদ্ধি ও ব্যাথা
(৯) রক্তক্ষরণ

প্রবল জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে দেখাতে হবে। ঠিকমত চিকিৎসা না হলে বা দেরিতে চিকিৎসা শুরু হলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

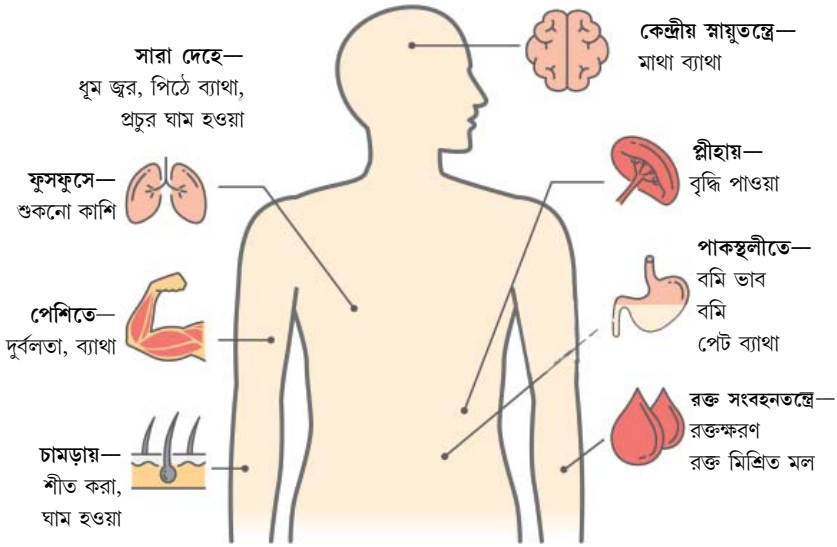

ম্যালেরিয়ার উপসর্গ ও লক্ষণ

ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা ও নির্ধারণ

সারা দেশে এখন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, এএনএম ও আশা কর্মী স্তরে এবং সমস্ত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কোন জ্বরের রোগী পেলে ডাবল অ্যান্টিজেন Rapid Diagnostic Kit (RDK) দিয়ে ম্যালেরিয়ার Rapid Diagnostic Test (RDT) করা হয় এবং দ্রুত ফ্যালসিপেরম, ভাইভ্যাক্স বা কিছু ক্ষেত্রে দুরকম সংক্রমণ (Mixed infection) চিহ্নিত করা (Diagnosed) যায়।

একই সাথে ব্লাড স্লাইড টেনে নিকটস্থ ল্যাবেরটরিতে একদিনের মধ্যে মাইক্রোসকপি পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া নির্ণয় (Confirmed) করার কথা। ম্যালেরিয়া স্লাইডে সংক্রমণের স্তর, ধরন ও ব্যাপকতা বোঝা যায়।

ম্যালেরিয়া চিকিৎসা

২০১৩-র ড্রাগ পলিসি অনুযায়ী সারা দেশে একই চিকিৎসা। শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চল ব্যতিক্রম। এই ওষুধগুলি প্রতিটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন রঙের প্যাকেটে পাওয়া যায়। গুরুতর অসুস্থতা, অজ্ঞান রোগী ও রোগের জটিলতার ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করতে হয়।

ক) ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা

১) ট্যাবলেট ক্লোরোকুইন (CQ) : ১০ মি.গ্রা. প্রতি কে.জি. ওজনে পরপর দুদিন, তারপর ৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজনে একদিন।

২) ট্যাবলেট প্রাইমাকুইন (PQ) :০.২৫ মি.গ্রা. প্রতি কে.জি. ওজনে ১৪ দিন। এক বছরের নিচে শিশু, গর্ভবতী মা ও জি ৬ পি ডি অভাবী ব্যক্তিদের প্রাইমাকুইন দেওয়া যায় না। প্রাইমাকুইন খাওয়ানোর সময় নজরদারি রাখতে হয়।

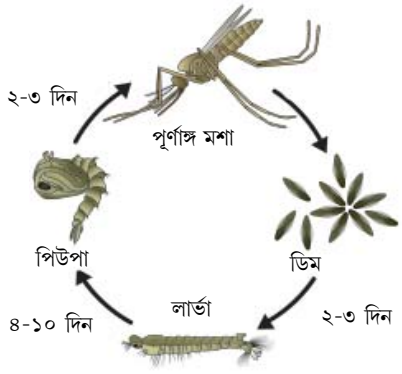

অ্যানোফিলিস মশার জীবনচক্র

বিভিন্ন বয়সীদের ওষুধের মাত্রা

(CQ ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেটে রয়েছে ১৫০ মি.গ্রা. বেস)

বয়স	প্রথম দিন		দ্বিতীয় দিন		তৃতীয় দিন		চতুর্থ থেকে ১৪তম দিন
	CQ (১৫০ মি.গ্রা. বেস)	PQ (২.৫ মি.গ্রা.)	CQ (১৫০ মি.গ্রা. বেস)	PQ (২.৫ মি.গ্রা.)	CQ (১৫০ মি.গ্রা. বেস)	PQ (২.৫ মি.গ্রা.)	PQ (২.৫ মি.গ্রা.)
< ১ বছর	১/২	০	১/২	০	১/৪	০	০
১-৪ বছর	১	১	২	১	১/২	১	১
৫-৮ বছর	২	২	২	২	১	২	২
৯-১৪ বছর	৩	৪	৩	৪	১১/২	৪	৪
> ১৫ বছর	৪	৬	৪	৬	২	৬	৬
গর্ভবতী মা	৪	০	৪	০	২	০	০

খ) ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা

১) আরটেমিসিনিন বেসড কম্বিনেশন থেরাপি (ACT-SP): ট্যাবলেট আরটিসুনেট (AS) ৪ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজনে তিন দিন এবং সালফাডক্সিন (S,২৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজন) ও পাইরিমেথামিন (P, ১.২৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজন) প্রথম দিন। ACT গর্ভবতীদের প্রথম তিন মাস (1st Trimester) দেওয়া যাবে না।

২) প্রাইমাকুইন (PQ): ০.৭৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজনে দ্বিতীয় দিন।

বিভিন্ন বয়সীদের ওষুধের মাত্রা

বয়স	প্রথম দিন		দ্বিতীয় দিন		তৃতীয় দিন
	AS	SP	AS	PQ	AS
০-১ বছর (গোলাপি প্যাকেট)	১ (২৫ মি.গ্রা.)	১ (২৫০+ ১২.৫ মি.গ্রা.)	১ (২৫ মি.গ্রা.)	০	১ (২৫ মি.গ্রা.)
১-৪ বছর (হলুদ প্যাকেট)	১ (৫০ মি.গ্রা.)	১ (৫০০+ ২৫ মি.গ্রা.)	১ (৫০ মি.গ্রা.)	১ (৭.৫ মি.গ্রা. বেস)	১ (৫০ মি.গ্রা.)
৫-৮ বছর (সবুজ প্যাকেট)	১ (১০০ মি.গ্রা.)	১ (৭৫০+ ৩৭.৫ মি.গ্রা.)	১ (১০০ মি.গ্রা.)	২ (১৫ মি.গ্রা. বেস)	১ (১০০ মি.গ্রা.)
৯-১৪ বছর (লাল প্যাকেট)	১ (১৫০ মি.গ্রা.)	২ (৫০০+ ৫০ মি.গ্রা.)	১ (১৫০ মি.গ্রা.)	৪ (৩০ মি.গ্রা.)	১ ১ (১৫০ মি.গ্রা.)
> ১৫ বছর (সাদা প্যাকেট)	১ (২০০ মি.গ্রা.)	২ (৭৫০+ ৭৫ মি.গ্রা.)	১ (২০০ মি.গ্রা.)	৬ (৪৫ মি.গ্রা.)	১ (২০০ মি.গ্রা.)

উত্তর পূর্বাঞ্চলে জীবাণুর প্রতিরোধ জন্ম নেওয়ায় ACT–SP এর পরিবর্তে Artemether (২০ মি.গ্রা.) + লুমেফ্যানট্রিন (১২০ মি.গ্রা.) কম্বিনেশন ACT–AL দেওয়া হয়। এটি ৫ বছরের নিচে শিশুদের ও গর্ভবতীদের দেওয়া যায় না।

গ) মিক্সড ইনফেকশনের চিকিৎসা

ফ্যালসিপেরামের তিন দিনের চিকিৎসা এবং ভাইভ্যাক্সের চতুর্থ থেকে ১৪ দিন অবধি প্রাইমাকুইন চিকিৎসা।

ঘ) গর্ভবতী ম্যালেরিয়া রোগীদের চিকিৎসা:

প্রথম তিন মাসের (Trimester) ক্ষেত্রে কুইনিন ১০ মিগ্রা। প্রতি কেজি ওজনে দিনে তিনবার করে সাত দিন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিন মাসের ক্ষেত্রে ACT–SP, / উত্তর পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে ACT–AL।

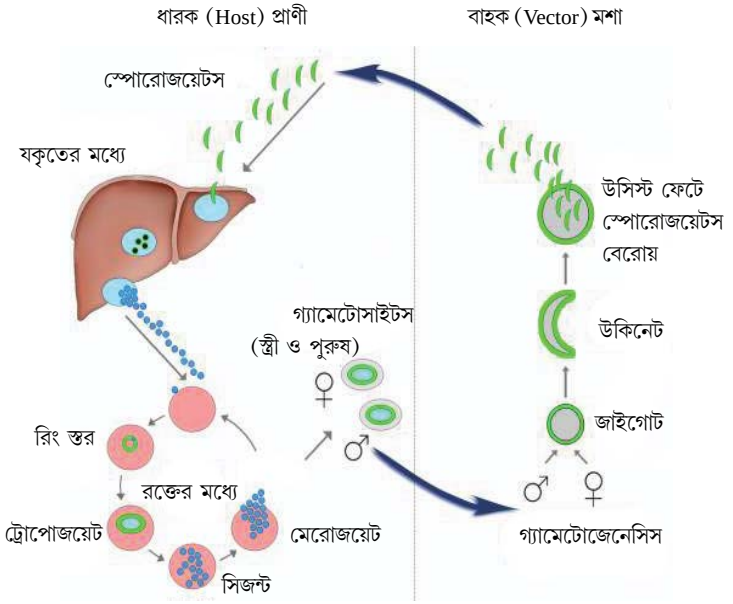

ম্যালেরিয়ার পরজীবী প্রোটোজোয়ার জীবনচক্র

ঙ) ভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রে (Chemoprophylaxis)

ছয় সপ্তাহের কম সময়ের জন্য ম্যালেরিয়া প্রবণ জায়গায় গেলে—ট্যাবলেট ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মি.গ্রা. রোজ। আট বছরের নিচে বাচ্চাদের দেওয়া যাবে না। ৮-১৫ বছর ১.৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজনে। বেরোনোর দুদিন আগে থেকে খেতে হবে এবং ফেরার পর চার সপ্তাহ।

ছয় সপ্তাহের বেশি যাত্রার ক্ষেত্রে—

ট্যাবলেট মেফ্লোকুইন ২৫০ মি.গ্রা. প্রতি সপ্তাহে। বেরোনোর দু-সপ্তাহ আগে থেকে এবং ফেরার পর চার সপ্তাহ।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ

এর প্রধানত দুটি অংশ। (এক) **মশার নিয়ন্ত্রণ**। এই নিয়ে নানারকম গবেষণা চলছে। Integrated Vector Management (IVM) চলছে। মোদ্দা কথা জল জমতে না দেওয়া বা জল জমলে তা পরিষ্কার করা বা বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা (Source Reduction) যাতে মশা বংশবৃদ্ধি না করতে পারে। লার্ভা নিধনের জন্য পরিবেশ

বান্ধব Biocidal ব্যবহার করা হয়। জলাশয়ে লার্ভা ধ্বংসকারী গাপ্পি ও গাম্বুসিয়া মাছ ছাড়া হয়। ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় বছরে দুবার Indoor Residual Spraying (IRS)-র ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতি বছর জুন মাসকে ম্যালেরিয়া মাস (Malaria Month) হিসাবে পালন করা হয় জনচেতনা বাড়ানো এবং যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন (STM), মেডিকেল কলেজগুলি প্রভৃতিতে ম্যালেরিয়া সহ পতঙ্গবাহিত রোগের উপরে গবেষণাতে জোর দেওয়া প্রয়োজন।

অ্যানোফিলিস মশার বংশবৃদ্ধি

(দুই) **ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (Personal Protection):** ঘরবাড়ি ও তার আশপাশ এবং পল্লীকে পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত রাখা। জল জমতে না দেওয়া। ঢাকা (Covered) ফুল হাতা জামা ও ফুল প্যান্ট সুতির পোশাক এবং ঢাকা জুতো ও মোজা পরা। ঘুমোনোর সময় মশারির (Bed Net) মধ্যে ঘুমোনো। ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় Long Lasting Impregnated Bed Net (LLIN) অথবা মশা নিবারক রাসায়নিক মাখানো মশারি ব্যবহার করা। এর জন্য স্বাস্থ্য ও সমাজ কর্মীদের মানুষকে ভালোভাবে বোঝাতে হয় (BCC বা Behavioural Change Communication)।

[সূত্র:

1. National Drug Policy on Malaria 2013–Directorate of National Vector Borne Disease Control Prog.
2. Manual on Integrated Vector Management in India 2022–National Center for Vector Borne Diseases Control
3. Medical Officers' Handbook for Clinical Management of Dengue & Malaria, 2018 – Depart. of Health & FW, GoWB
4. Davidson's Principles & Practice of Medicine (24th Edn.)
5. Current Medical Diagnosis & Treatment, 2023]

কিভাবে হয় ডেঙ্গু

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

ডেঙ্গু ভাইরাসবাহী মশা কামড়ালে ডেঙ্গু সংক্রমণ ঘটে।

সাধারণ ডেঙ্গুর উপসর্গ

অত্যধিক জ্বর (104^0F), প্রবল মাথা ব্যাথা, চামড়ায় লালচে ছোপ, চোখের পিছনে ব্যাথা, গা বমি ভাব/বমি হওয়া, শরীরে গাঁটে গাঁটে ব্যাথা।

গুরুতর ডেঙ্গুর উপসর্গ

পেটে ব্যাথা, বমি, শ্বাসকষ্ট, রক্তক্ষরণ, অস্থিরতা, নেতিয়ে পড়া।

শনাক্তকরণ

উপসর্গ দেখা দিলে রক্ত পরীক্ষাই শেষ কথা। প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে এলাইজা পদ্ধতিতে এন.এস.১ পরীক্ষায় ডেঙ্গুর অ্যান্টিজেন দেখে স্ক্রিনিং এবং পাঁচ দিনের পর ম্যাক এলাইজা পরীক্ষায় ডেঙ্গুর অ্যান্টিবডি দেখে প্রমাণ করা হয়। [ELISA: Enzyme-linked immunosorbant assay। ১৯৭১এ বিজ্ঞানী ইভা ইংভাল ও পিটার পার্লম্যান এই আধুনিক নির্ণয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। MAC-ELISA: IgM antibody capture enzyme-linked immunosorbant assay। এই পরীক্ষার নির্দিষ্টতা (Specificity) আরও বেশি।]

প্রাথমিক শুশ্রূষা

প্রাথমিক পর্যায়ে ভরা পেটে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। সঙ্গে তাজা ফল। দিনে রাতে মশারির মধ্যে থাকা।

চিকিৎসা

প্যারাসিটামল চলতে পারে। তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে যাওয়াই ভালো। এমন ওষুধ চলবে না, যা রক্তে অনুচক্রিকা কমিয়ে দিতে পারে। সাধারণ ডেঙ্গু এমনিতে সেরে যায়। রক্তক্ষরণ, শক ইত্যাদি হলে হাসপাতালে ভর্তি রেখে ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট, লাইফ সাপোর্ট ইত্যাদি সহযোগী চিকিৎসা চালাতে হয়।

প্রতিরোধ

এডিস মশার লার্ভাস্তরে স্প্রে করা। বাড়ির চারধারে জল জমতে না দেওয়া। ফুলদানি, চৌবাচ্চার জল নিয়মিত পাল্টানো। বাড়ির আশপাশের নোংরা জিনিস

পরিষ্কার করা। রাতে মশারি টাঙিয়ে শোয়া। দিনে মশা তাড়ানোর ম্যাট, কয়েল, লিকুইড ব্যবহার। গা ঢাকা পোশাক পরা।

মশা নিয়ে কথা

এডিস মশা ডেঙ্গুর ভাইরাস বহন করে। ডেঙ্গুর মশা সাধারণত দিনে কামড়ায়। চলতে ফিরতে থাকা মানুষকে আক্রমণ করে। সাধারণত কামড়ায় হাঁটুর নিচে। একনাগাড়ে কামড়ায় না, হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে। এডিস মশার উপাঙ্গে সাদা ছোপ থাকে। শূককীট বা লার্ভা অবস্থায় মারা সহজ, পূর্ণ বয়স্ক মশাকে মারা কঠিন।

নিজেকে তথা নিজের পরিবারকে রক্ষা করুন ডেঙ্গুর সংক্রমণের হাত থেকে।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০১৬)

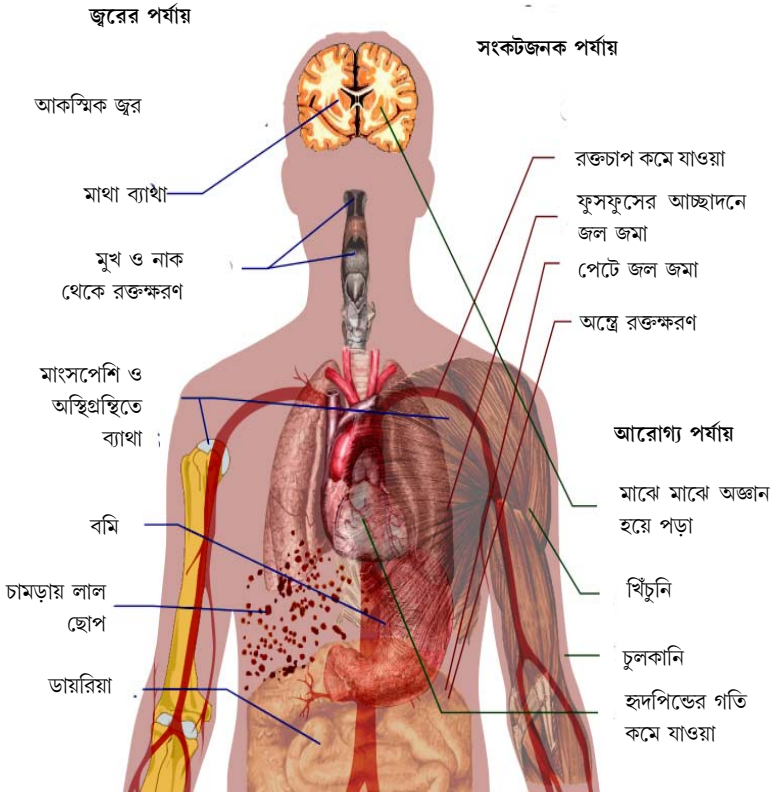

ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গ ও লক্ষণ

মশক বাহিত রোগ প্রতিরোধে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবশ্য করণীয়

(স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশনামা। অন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)

- প্রতি সপ্তাহে ছাদের ট্যাঙ্ক, ভূগর্ভস্থ জলাধার, এয়ারকুলার, ফুল বা গাছের টব, পশুপাখিদের খাবার দেবার জায়গা প্রভৃতি সম্ভাব্য মশার শূককীট জন্মানোর জায়গাগুলি পরীক্ষা করতে হবে।
- সমস্ত জলাধারকে মশানিরোধী ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- সমস্ত জল রাখার পাত্র, কুলার, টব প্রভৃতিকে সপ্তাহে একবার খালি করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- গাটার, ছাদ, ড্রেনের মুখ প্রভৃতি নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।
- পুকুর, সেসপুল, ফোয়ারা ইত্যাদি থাকলে গাম্বুসিয়া/গাপ্পি/তেলাপিয়া প্রজাতির মশার শূককীট ভক্ষণকারী মাছ ছাড়তে হবে।
- এলাকায় ম্যালাথিয়ন/সাইফেনথ্রিন ধোঁয়া (ফগিং) দিতে হবে।
- ঘরের মধ্যে ২ শতাংশ পাইরেথ্রিয়াম স্প্রে করতে হবে।
- রোগী ও অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাগুলি নিতে হবে। ওয়ার্ড, হস্টেল ও কর্মচারীদের আবাসনে মশারি ব্যবহার করতে হবে।
- দরজা-জানালায় সঠিকভাবে মশা নিরোধক নেট লাগাতে হবে।
- রোগী, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে হবে।
- পুরসভার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং নিয়মিত বর্জ্য পদার্থ সাফ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডেঙ্গি সে আজাদি'র ডাক

রাজ্যে ডেঙ্গির দাপট সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি চুপচাপ। এই পরিস্থিতেতে ১৫ আগস্ট 'ডেঙ্গি সে আজাদি'র ডাক দিয়ে পথে নেমেছে সদ্য-গঠিত যুব মঞ্চ ইয়ং বেঙ্গল। মূলত বামপন্থী ছাত্র-যুবকদের এই মঞ্চের তরফে প্রসেনজিৎ বসু জানান, তাঁরা রাজ্যে নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থানের দাবির সঙ্গে সঙ্গে জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আন্দোলন করবেন। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের 'ব্যর্থতা'র প্রতিবাদে ১৫ তারিখে শ্রীরামপুর ও কলকাতা পুরসভার সামনে সাফাই অভিযান হবে। ২ সেপ্টেম্বর সারা ভারত শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে এবং বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে সাইকেল মিছিল করবে ইয়ং বেঙ্গল। ছাত্র-যুবদের নিয়েই গড়া হয়েছে ওই মঞ্চ। নতুন সংগঠনকে স্বাগত জানিয়ে কনভেনশনে বক্তৃতা দেবেন সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মীরাতুন নাহার, মৌসুমী কয়াল প্রমুখ। (কৃতজ্ঞতা: আনন্দবাজার পত্রিকা)

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০১৬)

ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে অবশ্য পালনীয়

গৌতম মৃধা

ঘুমোনোর সময় (দিবানিদ্রার সময়েও) মশারির মধ্যে শোওয়া। কীটনাশক লাগানো মশারি হলে ভাল হয়। মশারি ভাল করে গদির মধ্যে গুজতে হবে। শিশু, প্রসূতি ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

ঘরের বাইরে, স্কুল কলেজে, অফিসে, কর্মক্ষেত্রে ফুলহাতা শার্ট, ফুলপ্যান্ট, মোজা ও ঢাকা জুতো (চপ্পল, কাবলি নয়) পরুন। মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্যান্ট-জামা যেখানে গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে সালোয়ার কামিজ পরা যেতে পারে। ঘরের মধ্যেও ঢাকা সুতির পোশাক পরতে হবে। এক-নাগাড়ে টেবিল-চেয়ারে বসে পড়লে বা কম্পিউটারে কাজ করলে পায়জামা-কামিজের সাথে সুতির মোটা মোজা পরুন।

থাকার ঘর হতে হবে পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বাতাস চলাচলযুক্ত। দেওয়ালের রঙ সাদা বা হাল্কা হলে ভাল। ঘরে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, আবর্জনা ইত্যাদি রাখবেন না। ঘরের কোনে, আলনা, পর্দা, খাটের তলা, আলমারির পিছন প্রভৃতি স্থান যেখানে অন্ধকারে বা আড়ালে এডিস মশা লুকিয়ে থাকে নিয়মিত ঝাড়বেন। সূর্য উদয় ও সূর্যাস্তের সময় কিছুক্ষণ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রাখতে পারেন। সন্ধ্যের মুখে নিমপাতা পোড়ানো, বিভিন্ন মশা মারার তেল, মেশিন ইত্যাদি মাঝে মাঝে চালাতে পারেন। মশা মারার রাসায়নিক বন্ধ ঘরে একটানা চালাবেন না তাহলে শরীরের অন্য ক্ষতি হতে পারে। ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় জল জমা রাখতে হলে পাত্রের মুখ ঢাকা দিয়ে রাখুন এবং নিয়মিত ব্যবহার করুন। ট্যাঙ্ক, চৌবাচ্চা, ড্রাম কিংবা এসি, ফ্রিজ, টব, ফুলদানির জল সপ্তাহে অন্তত একদিন পাল্টে ফেলুন। মাঝে মাঝে সেগুলোর ভেতরের দেওয়াল শুকিয়ে ভাল করে ঘষে পরিষ্কার করুন। এছাড়া বাড়ির মধ্যে ও বাইরে কোথাও জল জমতে দেবেন না।

এডিস মশা

প্রতিদিনের বর্জ্য পদার্থ পুরসভার সহায়তায় সরিয়ে ফেলুন। বাড়ির আশেপাশে, ড্রেনে, পিটে, বাগানে, ব্যাক-ইয়ার্ডে ময়লা ও জল জমতে দেবেন না। ডাব, নারকেলের মালা, মিষ্টি ভাঁড়, প্লাষ্টিক, টায়ার ইত্যাদিতে যেন জল না জমে। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। গৃহপালিত পশুর ঘর বা পোল্ট্রি থাকলে থাকার জায়গা থেকে দূরে রাখতে হবে। স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে, নেশা করা যাবে না, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। এভাবে শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ একইসাথে বাংলা বানান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা দিয়ে 'সহজপাঠে' বলেছিলেন, ''আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে।...'' মঙ্গলবার সম্ভব না হলেও প্রতি শনিবার বা রবিবার এলাকার তরুণরা মিলে এলাকাটিকে পরিষ্কার করার ও পরিষ্কার রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। বেকার সমস্যা রয়েছে ঠিকই তথাপি যত্রতত্র বাজার, খাবার দোকান ইত্যাদি বসানো ঠিক নয়। নির্মীয়মান বাড়িগুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এলাকার পার্ক ও জলাভূমিগুলিকে ঠিকমত সংস্কার করতে ও পরিষ্কার রাখতে হবে। জলাভূমিগুলিতে গাপ্পি মাছ ছাড়তে হবে এবং মাঝে মাঝে জল নাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে (সাঁতার, নৌকা চালানো, রোটেটর)।

সরকার, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতকে সহযোগিতা করতে হবে।

জ্বর হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ক্লিনিক অথবা হাসপাতালে দেখাতে হবে, প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করতে হবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে ঠিকমত চিকিৎসা করতে হবে।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, এপ্রিল ২০১৭)

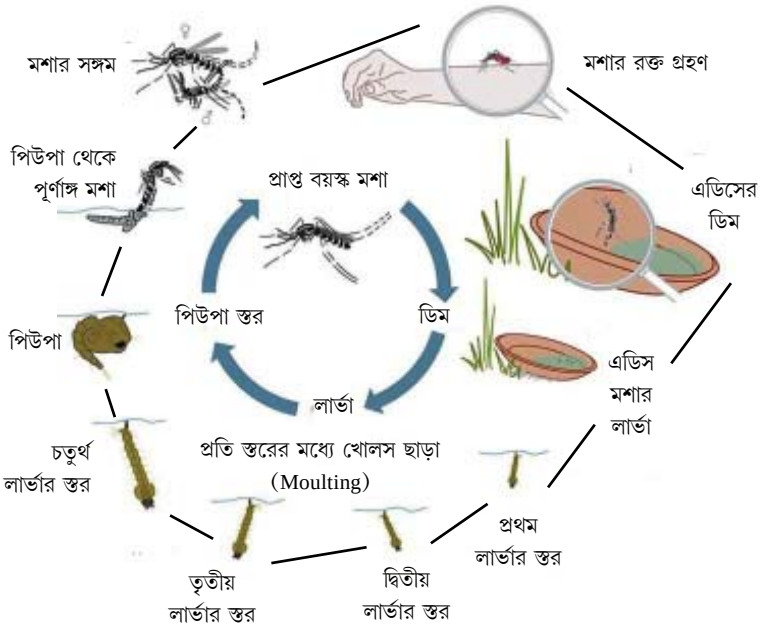

এডিস মশার জীবনচক্র

ডেঙ্গু জ্বর

সঞ্জয় সেনগুপ্ত

পরেশদা বিমর্ষ মুখে বসেছিলেন। পটলা প্রথম খেয়াল করল, 'কি বস্, মুখ শুকনো কেন? বৌদি আবার ঝাড় দিয়েছে?' বয়সে অনেকটা বড় হলেও পরেশবাবু এই ক্লাবের ছেলেগুলোর সঙ্গে বন্ধুর মতই মেশেন। তাই স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, 'একটু টেনসনে পড়ে গেছি রে। ছেলেটার কদিন ধরে ধূম জ্বর। অমিয় ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে বলেছেন ডেঙ্গু হতে পারে। অথচ বাবানকে হাসপাতালে ভর্তি করতে বারণই করলেন। বললেন পর্যাপ্ত নুন চিনির জল খাওয়াতে আর জ্বরের জন্য প্যারিসিটামল দিতে। অবশ্য প্রতিদিন রক্তের প্লেটলেট পরীক্ষা করাতে বলছেন। কাগজে এত কিছু লিখছে—ভাবছি নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়ে দেব কিনা।

পরের সপ্তাহে পরেশদার ছেলে বাড়িতেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল।

পরেশদা তো ডাক্তারবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গত কয়েক বছর ধরেই চারপাশে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আলোচনা চলছে। আতঙ্কিত পরিবার রোগীকে নিয়ে নার্সিংহোম, হাসপাতালের দরজায় দরজায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। রোগের সঙ্গে লড়তে গেলে প্রথমেই দরকার সচেতনতা। সরকারি বা বেসরকারি স্তরে এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টাও চলছে। চলুন না, এর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি।

প্রশ্ন ১ : ডেঙ্গু কি ধরনের রোগ?

উত্তর : ডেঙ্গু মশাবাহিত সংক্রামক জ্বর। রোগের কারণ ডেঙ্গু ভাইরাস। এই ভাইরাস ফ্লাভি ভাইরাস পারিবারের সদস্য। অন্যান্য কয়েকটি একই পরিবারভুক্ত ভাইরাস থেকে ইয়েলো ফিভার, এনকেফেলাইটিসের মত রোগ হয়। এই ধরনের বেশীরভাগ ভাইরাস সন্ধিপদ প্রাণীর যেমন মশার মাধ্যমেই ছড়ায়।

প্রশ্ন ২ : ডেঙ্গু কিভাবে ছড়ায়?

উত্তর : এডিস শ্রেণীর মশা বিশেষত এডিস ইজিপ্টি (Aedes aegypti) এই রোগের বাহক। স্ত্রী এডিস মশা রোগাক্রান্তর শরীর থেকে রক্ত পান করে (জ্বরের প্রথম দুই থেকে দশদিনের মধ্যে) আক্রান্ত হয়। এর আট থেকে দশদিন পরে সুস্থ মানুষের দেহে রক্তপানের সময় সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পারে। ভাইরাস কিন্তু মশার কোন শারীরিক ক্ষতি করে না।

এডিস মশা সকাল ও সন্ধেবেলা বেশি কামড়ালেও দিনের যে কোন সময়েই কামড়াতে পারে। এডিস ইজিপ্টি মানুষের কাছাকাছি জমা জলে ডিম পাড়ে এবং মানুষের রক্ত বেশি পছন্দ করে—এইজন্যই রোগ ছড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

প্রশ্ন ৩ : রোগটির লক্ষণ কি?

উত্তর : ডেঙ্গু অন্য বহু ভাইরাসজনিত জ্বরের মত হঠাৎ জ্বর, গায়ে হাতে ব্যাথা, মাথায় যন্ত্রণা ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ হয়। বিশেষ লক্ষণ বলতে চোখের পিছনে ব্যাথা এবং গায়ে হাতে প্রচন্ড যন্ত্রণার উল্লেখ করতে হয়। ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে ১৪ দিনের মধ্যে জ্বর আসে। তবে মনে রাখতে হবে শতকরা প্রায় আশি শতাংশ আক্রান্তই আপাতভাবে সুস্থ (Asymptomatic Infection) থাকেন। বাকি কুড়ি শতাংশের বেশিরভাগই প্রাথমিক জ্বরের পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। মাত্র পাঁচ শতাংশ রোগীর গুরুতর অসুবিধা দেখা দেয় এবং এদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। রোগাক্রমণকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে দুই থেকে সাত দিনের জ্বর আসে। এর মধ্যে জ্বর কমে আবার দ্বিতীয় দফায় তাপমাত্রা বাড়তে পারে (Biphasic)। অর্ধেকের বেশি আক্রান্তের দেহে হামের মত দাগ (rash) দেখা দেয়। বমিবমি ভাবও হয়।

অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে জ্বর ছেড়ে গেলেও সংক্রমণ জটিল আকার ধারণ করে। শিশু এবং অল্পবয়স্কদের ক্ষেত্রেই এই জটিলতা বেশি করে দেখা দেয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তপাত, বুকে বা পেটে জল জমে যাওয়া অথবা রক্তচাপ কমে 'শক' (shock) এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। রোগ জটিল হলে মৃত্যুও অসম্ভব নয়।

তবে অধিকাংশ রোগীই দু থেকে সাতদিনের মধ্যে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

প্রশ্ন ৪ : রোগের জটিলতার বিশেষ কোন পূর্ব লক্ষণ আছে কি?

উত্তর : বিশেষ কিছু লক্ষণের প্রাদুর্ভাব রোগ জটিলতা নির্দেশ করে যেমন—

প্রচন্ড পেটে ব্যাথা, ক্রমাগত বমি, যকৃৎ বৃদ্ধি (Liver enlargement), আবরণী ঝিল্লিতে (Mucosal membrane) রক্তপাত, দুর্বলতা, ছটফট করা, বুকে বা পেটে জল জমে যাওয়া বা রক্তে অনুচক্রিকার মাত্রা কমে যাওয়া।

ডেঙ্গু রোগে বিশেষ বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। স্নায়ুঘটিত দুর্বলতা, এমনকি অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। গর্ভবতী মহিলারা আক্রান্ত হলে ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে।

প্রশ্ন ৫ : ডেঙ্গু রোগ নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করার উপায় কি?

উত্তর : রোগের প্রকোপ যে সব জায়গায় বেশি, সেখানে রোগলক্ষণ দেখেই সনাক্ত করা হয়। জ্বরের সঙ্গে বমি, র‍্যাশ, সারা শরীরে ব্যাথা ইত্যাদি একাধিক লক্ষণ

থাকলে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার মাত্রা হ্রাস পায়। হাতে শক্ত করে বাধন দিয়ে কয়েক মিনিট রাখলে হাতের চামড়ায় ছোট ছোট রক্ত জমার দাগ দেখা দিতে পারে (tourniquet test)। এছাড়া জটিলতা সংক্রান্ত বিশেষ লক্ষণগুলি আগেই আলোচিত হয়েছে।

ডেঙ্গু রোগ সনাক্তকরণে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়। দ্রুত নির্ণয়ের জন্যে NS-1 অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাটি জ্বরের প্রথম দিন থেকেই Positive ফলাফল আসতে পারে। তাই রোগনির্ণয়ে পরীক্ষাটির ব্যবহার সীমিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ELISA পদ্ধতি অনুমোদন করে।

ডেঙ্গু ভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে ৫-৭ দিন সময় লাগে। প্রথমে IgM এবং পরে IgG শ্রেণীর অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এইধরনের অ্যান্টিবডির উপস্থিতি রোগাক্রমণের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বহন করে। ELISA পদ্ধতিতে নির্ণয় করে রোগ প্রমাণ করা হয়।

যেহেতু প্রথম সাতদিনের মধ্যে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবডি তৈরি হয় না, জ্বরের প্রথম সপ্তাহে ডেঙ্গুর সংক্রমণ প্রমাণ করতে ভাইরাস কালচার অথবা PCR পরীক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি দেখানো দরকার। তবে সাধারণ ল্যাবরেটরিতে এই জাতীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে না।

তবে সমস্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের নিয়মিত প্লেটলেট পরীক্ষা করা উচিৎ। এর মাত্রা হ্রাস পেলে রোগ জটিল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

প্রশ্ন ৬ : ডেঙ্গুর চিকিৎসা কি?

উত্তর : জটিলতা বিহীন ডেঙ্গু জ্বরে বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে না। পরিপূর্ণ বিশ্রাম, উপযুক্ত পথ্য ও পর্যাপ্ত জলপান ধীরে ধীরে রোগীকে সুস্থ করে তুলবে। জ্বরের জন্য Paracetamol ছাড়া আর কোনও ওষুধ ব্যবহার অনুচিত।

রোগ জটিল হলে শিরার মাধ্যমে স্যালাইন দেওয়ার দরকার। জটিলতর রোগে রক্ত অথবা অনুচক্রিকা চালাতে হয়।

এছাড়াও শকের উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হয়।

প্রশ্ন ৭ : রোগ প্রতিরোধের জন্য কি করা প্রয়োজন?

উত্তর : রোগ প্রতিরোধের প্রধান পথ ডেঙ্গু বাহকের অর্থাৎ এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধ। এর জন্য চারপাশে জল জমা বন্ধ করতে হবে। এর সঙ্গে মশার লার্ভার নিধনের জন্য ভেষজ লার্ভাসিডাল ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও এজন্য প্রাকৃতিক পদ্ধতিও (যেমন গাপ্পি জাতীয় মাছের চাষ যেগুলো মশার লার্ভা খেয়ে নেয়) ব্যবহার করা যেতে পারে। মশার বিস্তার রোধে আগে যে স্প্রে ব্যবহার হত

তার কার্যকারিতা সীমিত। হাত পা ঢাকা পোষাক বা মশারির ব্যবহার মশার কামড় থেকে বাঁচাতে পারে।

রোগের প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। কিছুটা সাফল্য মিললেও, এখনও নিরাপদ ও সস্তা ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয় নি।

সবশেষে বলতে হবে শুধুমাত্র সরকারি প্রচেষ্টায় রোগের দমন সম্ভব নয়। আমাদের সচেতন হতে হবে চারপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ব্যক্তিগত সর্তকতাও জরুরি। আর ডেঙ্গু হওয়া মানেই ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু রোগ আপনা থেকেই সেরে যায়।

প্রথমেই আমরা পরেশবাবুর ছেলের কথা জেনেছিলাম। এক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু একেবারে সঠিক পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথম কয়েকদিনের জ্বরের রোগীকে তিনি ডেঙ্গু হয়েছে বলেন নি বরং প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করিয়ে রোগাক্রমণের সম্ভাবনার উল্লেখ করেছিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য শারীরিক লক্ষণ দেখেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। আর অযথা উদ্বিগ্ন না হয়ে, বাড়িতে উপযুক্ত চিকিৎসার যে নিদান তিনি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ঠিক। অধিকাংশ আক্রান্ত সহজেই সেরে ওঠেন। তবে মনে রাখতে হবে জ্বর তিন চারদিনের মধ্যে না ছাড়লে ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়াটা জরুরি। তিনিই ঠিক করবেন ভর্তির প্রয়োজন আছে কিনা।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, এপ্রিল ২০১৭)

এডিস মশার ডিম

ডেঙ্গু নিয়ে দু-চার কথা

সব্যসাচী রায়

ডেঙ্গু আমাদের দেশ, তথা সারা পৃথিবীতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মশা বাহিত সংক্রামক ব্যাধি। প্রতিবছর বহু লোক এতে আক্রান্ত হন, এবং বেশ কিছু মৃত্যুও ঘটে, যার মধ্যে অনেকগুলোই আমরা আটকাতে পারি। এই মুহূর্তে, সারা পৃথিবী 'করোনা'র প্রকোপে কাবু, কিন্তু ডেঙ্গুর গুরুত্ব ভুললে চলবে না।

ডেঙ্গু একটি মশা বাহিত রোগ, যে মশা পরিষ্কার জলে জন্মায়, এবং ভোরের দিকে ও সন্ধ্যার দিকে সবচেয়ে বেশি কামড়ায়। বাড়ির আশেপাশে কিংবা বাড়ির মধ্যে জমে থাকা জঞ্জালের সাথে ডেঙ্গু হওয়ার খুব একটা সম্পর্ক নেই। বাড়ির মধ্যে কোথাও আধ ইঞ্চি পরিষ্কার জল এক সপ্তাহ বা তার বেশি দিন জমে থাকলে তাতে ডেঙ্গু মশার বংশবৃদ্ধি হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে, গ্লাসে, ফুলদানিতে, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত চৌবাচ্চা, পুরনো ব্যাটারির খোল, পুরনো টায়ার, ডাবের খোলায়, অথবা, জমে থাকা বৃষ্টির জল।

এই রোগ গরীব-বড়লোক প্রভেদ করেনা। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বা মারা গেছেন। বিগত ৭-৮ বছর ধরে আমাদের রাজ্যে এই রোগের প্রকোপ বেড়েছে। এই রোগ সম্বন্ধে কিছু প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অধুনা পাল্টে যাচ্ছে—যেমন, আগে ভাবা হত যে ডেঙ্গু শুধু গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে হয়, কিন্তু এখন দেখা গেছে যে সারা বছরই কম বেশি হচ্ছে। আবার, আগে ডেঙ্গু প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে হতো, এখন কিন্তু ডেঙ্গু গ্রামেও ছড়াচ্ছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে বিগত ৩-৪ বছরে, ডেঙ্গুতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও, মৃত্যুর সংখ্যায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এতে একটা জিনিস পরিষ্কার, যে, ভাইরাস-এর মারণশক্তি বাড়ছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ চার রকমের ডেঙ্গু ভাইরাস দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে কোন ভাইরাস শক্তিশালী থাকবে, তার উপর তার মারণশক্তি নির্ভর করে।

সারা পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশে ডেঙ্গু হয়ে থাকে, এবং গত ৫০ বছরে এর প্রাদুর্ভাব ৩০ গুণ বেড়ে গেছে। এই অসুখ কিন্তু সব ক্ষেত্রে মারাত্মক রূপ ধারণ করে না। জ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখালে, এবং ডাক্তার যদি মনে করেন যে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে ওনার পরামর্শ মেনে চললে ও কিছু পরীক্ষা করলে অধিকাংশ মৃত্যুই এড়ানো যায়। যদি ডাক্তারবাবু ডেঙ্গু নিরূপণ

করেন এবং রুগীকে ওষুধ দিয়ে বাড়ি ছেড়ে দেন, তাহলে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে—

১) রক্তক্ষরণ
২) ঝিমুনি অথবা অস্থিরতা
৩) খিচুঁনি
৪) শ্বাসকষ্ট
৫) বার বার বমি
৬) পেটে ব্যাথা
৭) চোখ মুখ ফুলে যাওয়া
৮) মাথা ঘোরা
৯) হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়া
১০) কম প্রস্রাব হওয়া

এই উপদেশ মেনে চললে কিন্তু অসুখটা বিপজ্জনক হলেও, চিকিৎসার সুযোগ থাকে। কিন্তু দেরি করলে সুযোগ কমে যাবে ও মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। আর যদি ডাক্তারবাবু প্রথমেই ভর্তি করে নেন, তাহলে তো আলাদা কথা।

বাড়িতে থাকা অবস্থায়, রুগীকে প্রচুর জল খাওয়াতে হবে (মোটামুটি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে সারাদিনে ৫ লিটার তরল খাওয়াতে হবে) ও বিপদচিহ্ন গুলোর দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল (ক্রোসিন/ক্যালপল) ছাড়া কিছু খাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে যে **অধিকাংশক্ষেত্রে বিপদ কিন্তু জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরেই হয়, তাই সেই সময়ে ও অন্তত তিনদিন বাড়িতে কড়া নজরদারিতে রাখতে হবে**। স্বাভাবিক সহজ পাচ্য খাবার খাবে।

এইসব উপদেশ মেনে চললে ডেঙ্গুর মৃত্যুহার কমানো যেতে পারে।

ডেঙ্গুর টিকা সবে বেড়িয়েছে, কিন্তু এখনও আমাদের দেশে উপলব্ধ নয়। তাছাড়া, এই টিকা খুব ছোট বাচ্চাদের উপর কাজ করে না। সুতরাং, ডেঙ্গু আটকানোর প্রধান দায়িত্ব আপনার, পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের নয়। বাড়িতে বা আশেপাশে জল জমতে দেবেন না।

এবার আসি ডেঙ্গুর কতগুলো অন্যরকম উপসর্গের কথা নিয়ে। আমরা জানি, ডেঙ্গুতে প্রধানতঃ জ্বর, গা হাত পা ব্যাথা, চোখের পিছনে ব্যাথা। রক্তক্ষরণ, চামড়ায় লাল লাল দাগ, হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, অস্থির ভাব, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত দেখা যায়। তবে, কোনও কোনও ডেঙ্গু অন্যভাবেও ধরা দিতে পারে, যেমন যকৃতের (liver) রোগ, বৃক্কের (kidney) রোগ, শ্বাসকষ্ট, অগ্নাশয়ের

(pancreas) রোগ, জ্বরের সাথে পাতলা পায়খানা, পিত্তথলির (gall bladder) রোগ, হৃদয়ের মাংসপেশির প্রদাহ (myocarditis), শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণ, হৃদয়ের গতির অনিয়মতা। সন্দেহ হলে ডাক্তারবাবু এসব ক্ষেত্রেও ডেঙ্গুর পরীক্ষা করেন। এমনকি জ্বর ছাড়া ডেঙ্গু হতে পারে। আমাদের মত দেশে, যেখানে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এত বেশি, সেখানে যথাযথ লক্ষণ না পেলেও, ডাক্তারবাবুরা অনেক সময়ে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা করেন এবং এই উপদেশ সবার মেনে চলা উচিত।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে এটাই প্রতিভাত হল যে ডেঙ্গু আটকানো কিংবা এর মৃত্যুহার কমানো অনেকটাই আপনার হাতে। কোথাও জল জমতে দেবেন না, মশারি ব্যবহার করুন ও জ্বর হলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। নিজে সাবধানে থাকুন, অপরকে সাবধান করুন।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০২০)

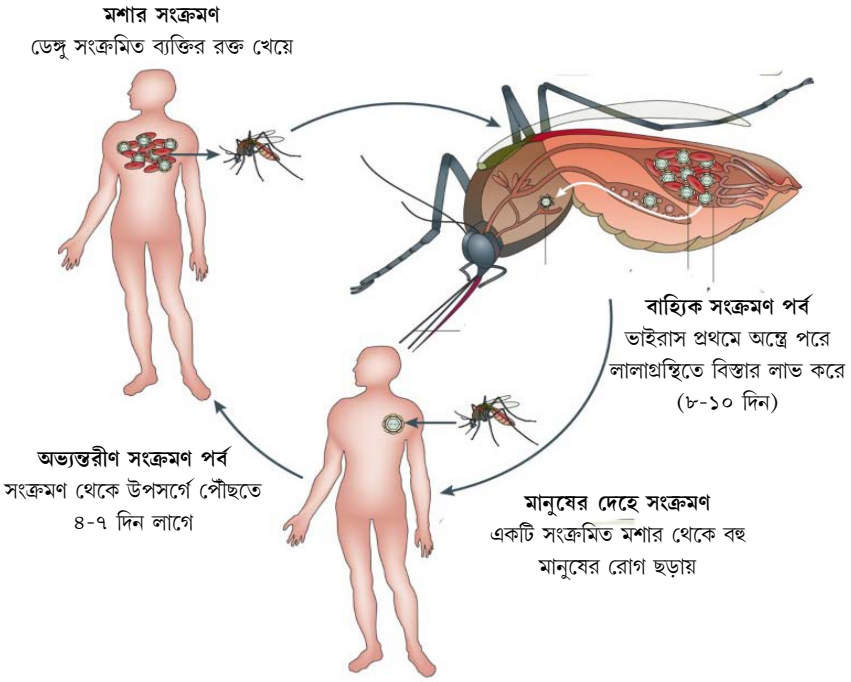

ডেঙ্গু ভাইরাসের জীবনচক্র

ডেঙ্গু নিয়ে এতো চিন্তার কারণ কি?

অভিমন্যু তরফদার

আমরা জেনেছি যে স্ত্রী (Female) এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয়। এডিস মশা সাধারণত দিনে কামড়ায়। এডিস ইজিপটি (Aedes aegypti) ও এডিস অ্যালবোপিকটাস (A. albopictus) এই দুই প্রজাতিই আমাদের দেশের এই রোগের প্রধান বাহক। সংক্রমিত মানুষের রক্তপান করার পর মশার দেহে এক তারের (Single Stranded) আর.এন.এ. ফ্ল্যাবিভাইরাস ৮-১০ দিনে বাহ্যিক জীবন চক্রের (Extrinsic Life Cycle) মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইবার সংক্রমিত মশা কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে সাধারণত ৪-৭ দিনের মধ্যে (Incubation Period) সেই ব্যক্তি ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হন। পরিবেশে ১৬-২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ৬০-৮০ শতাংশ আদ্রতায় মশার বংশবৃদ্ধির সুবিধা হয়। চার রকমের ডেঙ্গু ভাইরাসের সেরোটাইপ পাওয়া গেছে—DEN V1, 2,

সমস্ত বাহুতে লালচে ছোপ

ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার

3 & 4। এর মধ্যে DEN 2 & 3 বেশি রোগ ছড়িয়েছে। অপরিচ্ছন্নতা, অপরিকল্পিত নির্মাণ ও নগরায়ন; জনসংখ্যার যাতায়াত বৃদ্ধি এবং অন্যত্র গমন (Migration) এই রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণ। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন, ভূপৃষ্টের উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘ ও অনিয়মিত বর্ষা এডিস মশার বংশবৃদ্ধির কারণ।

- **ডেঙ্গু মশার ডিমের টিকে থাকার বিশেষ ক্ষমতা :**

সাধারণত এডিস মশা কোন জমে থাকা জলের উপরের স্তর ঘেঁষে সেই স্থান বা পাত্রের গায়ে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে লার্ভা, পিউপা হয়ে পূর্ণাঙ্গ মশা

হতে সাতদিনের মত সময় লাগে। কোন কারণে সেই জল শুকিয়ে গেলে বা ফেলে দিলেও ডিমগুলি থেকে যায়। প্রবল গরমে ও ঠাণ্ডায় তাদের কিছু হয় না। একটু জল পেলেই একদিনের মধ্যে লার্ভা হয়ে যায়। এই পদ্ধতিটিকে Dessication বলে। আর এর জন্যেই এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন স্ত্রী মশা সংক্রমিত হলে তার জীবিতকালে দু-থেকে তিন সপ্তাহে অন্তত তিনবার ডিম পাড়ে। একেকবারে গড়ে ১০০টি করে ডিম। এই ডিমগুলি থেকে যে পূর্ণাঙ্গ মশা জন্মায় তারা জন্মসূত্রে সংক্রমিত থাকে। এই কারণেও ডেঙ্গু সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

- **ডেঙ্গু জীবাণুর কয়েকটি বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য :**

১. আগে এক ধরনের ডেঙ্গু হলে পরেরবার অন্য ধরনের ডেঙ্গু সংক্রমণকে আটকানো যায় না।
২. ডেঙ্গু সংক্রমণের পর একেক ব্যক্তির একেকরকম প্রতিক্রিয়া হয়।
৩. অনেক ভাইরাল অসুখ একবার হলে সাধারণত দ্বিতীয়বার হয় না। কিন্তু ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারও হতে পারে। দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু হলে সমস্যা ও জটিলতা বেড়ে যায়।
৪. ডেঙ্গুর নতুন সংক্রমণের অ্যান্টিজেন ও আগের সংক্রমণের ফলে উৎপন্ন অ্যান্টিবডির প্রতিক্রিয়া রোগের মাত্রা ও ব্যাপকতা বাড়িয়ে দেয়।

- **ডেঙ্গু সংক্রমণের ফলে শারীরিক পরিবর্তন :**

এখনবধি যা জানা গেছে, সংক্রমিত ডেঙ্গু মশার কামড়ে ডেঙ্গু ভাইরাস মানব শরীরে প্রবেশ করে দ্রুত লসিকাগ্রন্থি বা লিম্ফগ্ল্যাণ্ডগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তারপর বিভিন্ন রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে। ৩-৭ দিন ভাইরাসের এই বৃদ্ধি চলে।

এর সাথে দ্বিতীয়বার সংক্রমণের (Repeat Infection) ক্ষেত্রে আগের সংক্রমণ জনিত টি-সেল মেডিয়েটেড অ্যান্টিবডির সাথে নতুন সংক্রমণের অ্যান্টিজেনের প্রতিক্রিয়া (Cross Reaction) হয়ে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার অংশ বিভিন্ন কমপ্লিমেন্ট প্রোডাক্টস (Complement Products) বিশেষ করে সাইটোকাইন (Cytakines) ও কেমোকাইন (Chemokines) নিঃসৃত হয়। এই সাইটোকাইন সুনামি বা ঝড় আমাদের রক্তবাহী নালীগুলির এণ্ডোথেলিয়াল কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রক্তকণিকাগুলি সংক্রমিত হয়, ধ্বংস করে অণুচক্রিকা বা প্লেটলেটস কণাগুলি এবং ক্ষতি করে দেহস্থ প্রধান অঙ্গগুলির (Vital Organs)। রক্তনালীগুলির গুরুতর

ক্ষতি করে (Vasculopathy) এবং রক্ততঞ্চন ব্যবস্থাকেও নষ্ট করে দেয় (Coagulopathy)।

এরফলে রক্তনালীর মধ্য দিয়ে রক্তের তরল এমনকি কোষের গমনাগমন (Capillary Permeability) বৃদ্ধি পায়। রক্তের প্রোটিন যুক্ত তরল পদার্থ (Plasma) রক্তনালী থেকে বেরিয়ে আশপাশের কোষে জমা হয় (Plasma Leakage)। এর সাথে রক্তক্ষরণ হয় (Haemorrhage) এবং রোগী দ্রুত বিপদসঙ্কুল শক স্তরে পৌঁছে যায়। ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার (Dengue Haemorrhagic Fever or DHF) থেকে ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে (Dengue Shock Syndrome or DSS) পৌঁছে যায়।

ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভারের উপসর্গ ও লক্ষণ সমূহ—

উপসর্গ	লক্ষণ
ঘাম দেওয়া	রক্তচাপ কমে যায়
রক্তক্ষরণ	নাড়ি দুর্বল ও দ্রুত হওয়া
চামড়ায় লাল লাল ছোপ	চামড়া কিছুক্ষণ চেপে রাখলে লাল লাল দাগ হয়ে যাওয়া
বমি ভাব ও বমি	ফুসফুসের ঝিল্লিতে জল জমা
পেট ব্যাথা	পেটে জল জমা
প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া	হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া
এর সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি (Vital Organs)	রক্তের কোষগুলি ঘনীভূত হওয়া (Haemoconcentration)
অকেজো হতে শুরু করে	

- **ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা :**

রক্তের কোষ ঘনীভূত হয় (Haemoconcentration) বিভিন্ন রক্তপরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায়। এছাড়াও লোহিত কণিকা (Erythrocytes), শ্বেত কণিকা (Leucocytes) ও অনুচক্রিকা (Thrombocytes or Platelets) কমে যায়। লিভার এনজাইমগুলি বৃদ্ধি পায়। সি-রিয়াকটিভ প্রোটিন (C Reactive Protein), ডি-ডাইমার (D-dimer) প্রভৃতির মাত্রা বেড়ে যায়। সরাসরি রোগীর দেহে স্টেথোসকোপ চেপে ধরলে, বা ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্রের কাফ কিংবা টুর্নিকেট কিছুক্ষণ বেধে রাখলে সেই জায়গা গভীর লাল হয়ে যাবে।

সরকারিভাবে প্রমাণ (Confirmed) হিসাবে দুটি পরীক্ষার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

১) সংক্রমণের প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে এলাইজা বেসড NS1 অ্যান্টিজেন পরীক্ষা।

২) সংক্রমণের ছয় থেকে দশদিনের মধ্যে MAC ELISA অ্যান্টিবডি পরীক্ষা।

সাধারণভাবে রোগীকে বিশ্রামে রাখতে হবে। বেশি করে জল, ফলের রস, প্রয়োজনে ও.আর.এস খাওয়াতে হবে। ঠান্ডা বা ঈষৎ উষ্ণ জল দিয়ে গা মোছানো যেতে পারে। বেশি জ্বর (১০২° ফারেনহাইটের বেশি) হলে প্যারাসিটামল দিতে হবে।

ডেঙ্গুর নির্দিষ্ট কোন ওষুধ নেই। লক্ষণজনিত চিকিৎসা, সঠিক ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট এবং লাইফ সাপোর্ট চিকিৎসার তিনটি প্রধান দিক। হাসপাতালে ভর্তি করে রক্তের মত (Isotonic) এবং একই বিনিময় ক্ষমতা সম্পন্ন (Iso osmolar) ফ্লুইড দিতে হবে (NaCl, Ringer Lactate প্রভৃতি কিংবা Balanced Crystalloid)।

শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসকরা ফ্লুইডের মাত্রা স্থির করেন। এই সময়টা রোগীকে সর্বক্ষণ নজরদারিতে (Monitoring) রাখতে হয়। রক্ত ও অনুচক্রিকা কমে গেলে বা রক্তপাত বৃদ্ধি পেলে রোগীকে প্রয়োজনীয় রক্ত (Blood Transfusion) এবং/বা অনুচক্রিকা (Platelet Transfusion) দিতে হবে।

ডেঙ্গু রোগীদের ছবি

কীভাবে হয় ডেঙ্গু?

ডেঙ্গু ভাইরাসবাহী
মশা কামড়ালে

সাধারণ ডেঙ্গুর উপসর্গ

অত্যাধিক জ্বর। কখনও
কম, কখনও বেশি

শরীরে গাঁটে গাঁটে
ব্যথা, অবসন্নতা

প্রস্রাবে জ্বালাভাব। কম হওয়া

খাবারে অনীহা।
ভাতে অরুচি

হেমারেজিক ডেঙ্গুর উপসর্গ

হাতের তালু, গায়ে লাল ছোপ

চোখ জ্বালা করা। চোখ
লালচে হয়ে থাকা।

পেটে যন্ত্রণা, অনেক সময় বমি।
পাতলা পায়খানা

হাত ফেটে রক্ত পড়া

মারাত্মক দুর্বলতা।
কপালে অসহ্য ব্যথা

শনাক্তকরণ

উপসর্গ দেখা দিলে রক্ত পরীক্ষাই শেষ কথা

চিকিৎসা

- প্যারাসিটামল চলতে পারে। তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে যাওয়াই ভালো
- এমন ওষুধ চলবে না, যা রক্তে অনুচক্রিকা কমিয়ে দিতে পারে

প্রাথমিক শুশ্রূষা

- প্রাথমিক পর্যায়ে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট
- প্রচুর পরিমানে জল খেতে হবে। সঙ্গে তাজা ফল
- দিনে রাতে মশারির মধ্যে থাকা

প্রতিরোধ

- এডিস মশার লার্ভান্তরে স্প্রে করা
- বাড়ির চারধারে জল জমতে না দেওয়া
- ফুলদানি, টোবাচ্চার জল নিয়মিত পালটানো
- বাড়ির আশপাশের নোংরা জিনিস পরিস্কার করা
- রাতে মশারি টাঙিয়ে শোয়া
- দিনে মশা তাড়ানোর ম্যাট, কয়েল, লিক্যুইড ব্যবহার
- পা ঢাকা পোশাক পরা

মশা নিয়ে কথা

- এডিস মশা ডাইরাস বহন করে
- ডেঙ্গুর মশা সাধারণত দিনে কামড়ায়
- চলতে ফিরতে থাকা মানুষকে আক্রমণ করে
- সাধারণত কামড়ায় হাঁটুর নিচে
- একনাগাড়ে কামড়ায় না হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে
- এডিস মশার উপাঙ্গে সাদা ছোপ থাকে

**নিজেকে তথা নিজের পরিবারকে
রক্ষা করুন ডেঙ্গুর হাত থেকে!**

জনস্বাস্থ্য বিভাগ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়,
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কর্তৃক প্রচারিত।

ডেঙ্গু সংক্রান্ত একটি প্রচারপত্র

উত্তরবঙ্গে অজানা জ্বরের অজানা কাহিনী

গৌতম মৃধা

প্রতি বছরের মত অথবা প্রতি এক বা দু'বছর অন্তর প্রাক-বর্ষার মশা বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব এবারও কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে তান্ডব চালালো। ছিনিয়ে নিল বেশ কিছু অমূল্য প্রাণ। এই রোগগুলির মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে ডেঙ্গু বা ডেঙ্গি এবং ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার দাপট ছিল বেশী। মিউটেশন ঘটিয়ে জীবাণুগুলি হয়ে পড়েছিল অবধ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সর্বাত্মকভাবে না ঝাঁপিয়ে বর্তমান সরকার অস্বীকার বা কম করে দেখানোর প্রতিযোগিতায় নামলেন এবং অচিরেই ছাপিয়ে গেলেন পূর্বসূরী সরকারকে। মৃত রোগীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির হাহাকার তারা শুনেও শুনলেন না। যত্রতত্র বাজার, আবর্জনার স্তুপ, নোংরাজল ভরা গর্ত ও জলাশয়, বুজে যাওয়া ড্রেন, অগুন্তি নির্মীয়মান বাড়ি ও রাস্তা, অভিবাসনের উপর নজরদারির অভাব, সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসা, পুরসভাগুলির অবহেলা, নাগরিক অসচেতনা—এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়ে সরকারি মুখপাত্র সংখ্যাতত্ত্বের জাগলারি ও অন্য প্রাদুর্ভাবপূর্ণ রাজ্যগুলির তুলনা টানায় ব্যস্ত থাকলেন। এই সামান্য বোধটুকুর তারা পরিচয় দিলেন না যে তাদের কথামত এন.এস.পজিটিভ না হলে ডেঙ্গি প্রমাণিত যেমন বলা যাবে না, তেমনি তাদের সরবরাহের অভাব, অব্যবস্থা, ফাঁকিবাজি, অদক্ষতার জন্য 'এলাইজা' পরীক্ষা, করতে না পারা এন.এস.পজিটিভ অজানা জ্বরগুলিকে ডেঙ্গি নয় এটাও বলা যায় না।

খোদ রাজধানী কলকাতা ও সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির প্রতিই যদি এই মনোভাব হয় সেক্ষেত্রে দূরবর্তী পশ্চদপর চিরঅবহেলিত উত্তরবঙ্গকে তো দেখাই হবে না। ঠিক হলও তাই। সেপ্টেম্বরের মাঝ থেকে অক্টোবরের প্রথম দিক অবধি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে যে জাপানি এনকেফেলাইটিস, ডেঙ্গি, ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, ইনফ্লুয়েনজা ও 'হ্যান্ড-ফুট-অ্যান্ড-মাউথ' রোগের ভয়ানক মহামারি হল এবং বেশ কিছু প্রাণহানি ঘটল তাতে, সরকার উদাসীন থাকলেন। এত চাপাচাপির মধ্যেও যে আংশিক সরকারি তথ্য মিলছে তাতেই চমকে উঠতে হয়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি পূর্ব-উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরকে কেন্দ্র করে পশ্চিমে দিল্লি হরিয়ানা সীমান্ত থেকে পূর্বে অসমের শিবসাগর অবধি যে ভারতের প্রধান

জাপানি এনকেফেলাইটিস বলয় তার অন্তর্গত। প্রতি বছরের মত এই বছরেও কয়েক হাজার শিশুর এখানে Acute Encephalitis Syndrome (AES) [পরীক্ষাগারে প্রমাণিত না করতে পারা জাপানি এনকেফেলাইটিস কেসগুলিকেও এই গোত্রে ফেলা হয়] হয়েছিল ও কয়েকশো মারা যায়। বাকিরা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলের দুর্গম, পশ্চাদপর ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি, প্রাথমিক চিকিৎসাই যেখানে মেলেনা, সেখানে AES চিহ্নিত করা দুরূহ এবং গবেষণাগারে জাপানি এনকেফেলাইটিস প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। সেখানেই এবার জলপাইগুড়িতে ২০টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৬টি, দার্জিলিঙ জেলায় ৩টি এবং কোচবিহারে ২টি জাপানি এনকেফেলাইটিস কেস পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে। কেবলমাত্র দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলাতেই ১২৯টি AES পাওয়া গেছে যার মধ্যে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রচুর ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ও চিকুনগুনিয়া পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে। ইনফ্লুয়েনজা নির্ণয়ের পরিকাঠামো ব্যবস্থাই নেই আর 'হ্যান্ড-ফুট-অ্যান্ড-মাউথ ডিজিজ' অজানা অথবা অবহেলিত থেকে গেছে।

প্রতি বছর উত্তরবঙ্গের দরিদ্র কৃষিজীবী আদিবাসী, রাজবংশী ও মুসলমান পরিবারগুলির এতগুলি করে শিশু সন্দেহজনক জাপানি এনকেফেলাইটিস রোগে মারা যায় বা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তাদের বাণিজ্যিক চিকিৎসকদের দ্বারা ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য পরিবারগুলিকে ভিটেমাটি বিক্রি-করতে হয়। অথচ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রস্তুত কমদামের কার্যকর টিকা রয়েছে। এগুলিকে নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এতদিন যুক্তি দেখানো হচ্ছিল গবেষণাগারে জাপানি এনকেফেলাইটিস প্রমাণিত না হলে এনকেফেলাইটিসের টিকা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। প্রথমে মৃত্যু হয়ে যাওয়া রোগীদের রক্তপরীক্ষা করা যায় নি। পরে কিছু রাজ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্যোগে, কিছু জেলা আধিকারিক এবং জেলা ও ব্লক স্তরের চিকিৎসকের সহযোগিতায়, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে মেডিকেল কলেজের একজন উৎসাহী প্যাথোলোজিস্টের পরিশ্রমে অল্প সময়ে ৩১টি জাপানি এনকেফেলাইটিস প্রমাণিত হয়। অচিরেই কিটের অভাব, কাজের চাপ, অন্যত্র করুন এইসব অজুহাতে পূর্বোক্ত প্রচেষ্টাকেও বানচাল করে দেওয়া হয়েছে। এই সামান্য সময়েই যে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে সেক্ষেত্রে জাপানি এনকেফেলাইটিস টিকাকরণে বাধা কোথায়? সম্প্রতি ঘোষিত কেন্দ্রের ৪০০০ কোটির বেশি টাকার জাপানি এনকেফেলাইটিস নিরাময় প্রকল্পের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে কি? 'হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট্', 'জাতীয় এইডস্ নিরাময় কর্মসূচী', 'জাতীয় গ্রামীণ

স্বাস্থ্য মিশনের' কয়েক শত বা কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের পর স্বাস্থ্য মাফিয়ারা বোধহয় দরিদ্র শিশুদের প্রাণের বিনিময়ে নতুন মুনাফার ফন্দি আঁটছে? সম্প্রতি একটি আশার খবর এসেছে। অনেক টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জন্য ২০১৩-তে জাপানি এনকেলেলাইটিস টিকাকরণের প্রচার শুরু করতে চলেছেন। তবে আশ্চর্যজনক ভাবে কোচবিহার জেলাকে বাদ রাখা হয়েছে।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, জানুয়ারি ২০১৩)

জাপানি এনকেফেলাইটিস রোগী

কিউলেক্স মশা

এনকেফেলাইটিস ও শিশুমৃত্যু এবং তার থেকে বাঁচার উপায়

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব উত্তরপ্রদেশ বা পূর্বাঞ্চল, উত্তর বিহার, উত্তরবঙ্গ, অসম, মালকানগিরি, পুনরায় গোরখপুর—একের পর এক এনকেফেলাইটিস মহামারি এবং তার প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় অজ্ঞতা, অপর্যাপ্ততা ও অব্যবস্থা শয়ে শয়ে শিশুকে প্রতিবছর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলি মূলত চারটি রোগের কারণে হচ্ছে : (১) জাপানি এনকেফেলাইটিস, (২) অন্যান্য ভাইরাল এনকেফেলাইটিস, (৩) টিক বা স্ক্রাব টাইফাস এবং (৪) অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। মূলত অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ; দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা ও অসচেতনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পশ্চাদপদতা; দুর্বল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা; রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবহেলা এগুলির উৎস। মশা, ইঁদুর, অন্যান্য পশু নিয়ন্ত্রণ না করতে পারা, তাদের সাথে যথেচ্ছ মেলামেশা, তাদের মল-মূত্র প্রভৃতি জনিত দূষণ এগুলি বৃদ্ধির কারণ। এদের মধ্যে জাপানি এনকেফেলাইটিসে মৃত্যু সর্বাধিক। **এই**

নোংরা জলে কিউলেক্স মশার বংশবৃদ্ধি

সাঙ্ঘাতিক রোগটি হলে হয় মৃত্যু, নয় পঙ্গুত্ব। সারা ভারত বিশেষত উত্তরভারত জুড়েই এর ভয়াবহ প্রকোপ। অথচ এর কার্যকর টিকা রয়েছে। সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না।

(এক) জাপানি এনকেফেলাইটিস :

এক ধরনের আরবোভাইরাস। প্রথমে পরিযায়ী পাখিদের দেহে বৃদ্ধি পায়। বর্ষায় ধান ক্ষেতে যখন এই পাখিরা মাছ-শামুক-ব্যাঙাচি-পোকা খেতে আসে তখন ধানক্ষেত, পাট পচা ডোবা, নোংরা নর্দমায় জন্মানো কিউলেক্স মশা পাখিদের কামড়ে জীবাণু নিয়ে পরে শুয়োর বা অন্যান্য পশুদের কামড়ালে, তাদের দেহে সংক্রমণ হয়। তবে সেটা মানুষের মত বাড়াবাড়ি হয় না। এবার আবার কিউলেক্স মশা তাদের কামড়িয়ে পরে মানুষকে কামড়ালে মানুষের দেহে জাপানি এনকেফেলাইটিস সংক্রমণ হয়। সাধারণত শিশু এবং বালক-বালিকারা বেশি আক্রান্ত হয়। তবে মানুষ থেকে মানুষ এ রোগ ছড়ায় না।

প্রবল জ্বর, মাথা ও গা ব্যাথা, মস্তিষ্কের প্রদাহ জনিত খিঁচুনি ও অন্যান্য সমস্যা এবং দ্রুত কোমা, তারপর মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে রোগীরা। কোনক্রমে বেঁচে ফিরলেও মস্তিষ্কের অসারতা/এবং পঙ্গুত্ব। আধুনিক এলাইজা পদ্ধতিতে রক্ত বা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (সি.এস.এফ.) নমুনা পরীক্ষা করলে নির্ণয় করা যায়। এর কোন ওষুধ নেই। সাপোর্টিভ চিকিৎসা অর্থাৎ প্রয়োজনমত ফ্লুইড, অক্সিজেন, ক্যাথেটার, সাকশান, ভেন্টিলেটর, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার কমানো ইত্যাদি।

জাপানি এনকেফেলাইটিস থেকে বাঁচার পথ : (১) শিশুদের ন'মাস এবং দেড় থেকে দু বছর বয়সে দুটি ডোজ টিকা নেওয়া। টিকা না নেওয়া থাকলে ১৫ বছর বয়স অবধি চার সপ্তাহ ব্যবধানে দুটি ডোজ টিকা নেওয়া। মহামারি প্রবণ এলাকায় প্রাপ্তবয়স্কদেরও টিকা দেবার ব্যবস্থা করা। (২) শোওয়া ও ঘুমোনোর সময় ভালো করে মশারি খাটানো এবং বিশেষ করে সন্ধ্যের পর ঢাকা পোশাক পরা। (৩) ঘরের ভেতর পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা, ঘরের মধ্যে ও বাইরে পরিষ্কার রাখা। কোথাও নোংরা জল জমতে না দেওয়া। ভোর ও সন্ধ্যেয় মশারা বেরোনোর সময় জানালা ও দরজা বন্ধ রাখা। (৪) শুয়োর সহ পশুপাখি, থাকার জায়গা থেকে দূরে রাখা। তাদের খোঁয়াড় পরিষ্কার রাখা এবং নিয়মিত তাদের টিকা দেওয়া। (৫) ধান খেত ও পাটের ডোবার জল অন্তত সপ্তাহে একবার রিসাইকেল বা রোটেট করা অথবা বের করে দেওয়া যাতে কিউলেক্স মশার

লার্ভা না জন্মায়। (৬) কোথাও লার্ভা জন্মালে লার্ভিসাইড লিকুইড বা স্প্রে এবং এডাল্ট মশা তাড়াতে আল্ট্রা লো ভলিউম ফিউমিগেশন ধোঁয়া ছাড়া হয়।

(দুই) অন্যান্য এনকেফেলাইটিস এবং অন্যান্য কারণে অ্যাকিউট এনকেফেলাইটিস সিনড্রোম (এ.ই.এস.) :

ম্যালেরিয়া থেকে বিষক্রিয়া, বহু কারণে এ.ই.এস. হতে পারে। আবার এন্টারো ভাইরাস থেকে টিক মাইট, বহু কারণে এনকেফেলাইটিস হতে পারে। এক একটির একেক রকম ম্যানেজমেন্ট। জাপানি এনকেফেলাইটিসের পর সবচাইতে বেশি হয় এন্টারো ভাইরাস জনিত এনকেফেলাইটিস, যেগুলি মূলত দূষিত জল, মল-মূত্র পানীয় জলে মিশ্রণের ফলে হয়। এর থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন: (১) পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং পরিশ্রুত জল পান। এছাড়া পরিশ্রুত জলে রান্না করা, মুখ ধোওয়া ও বাসন মাজা-ধোওয়া। (২) প্রতিটি গৃহে স্যানিটারি ল্যাটরিনের ব্যবস্থা করা। (৩) কুকুর-বিড়ালসহ সমস্ত বেওয়ারিশ পশুর নিয়ন্ত্রণ। (৪) ঘর,

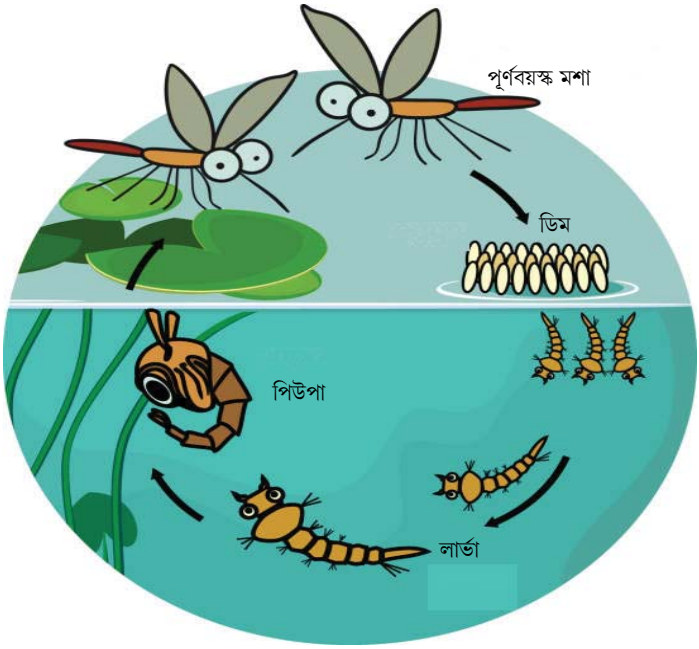

কিউলেক্স মশার জীবনচক্র

ঘরের চারপাশ, এলাকা, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি স্থান পরিষ্কার রাখা। (৫) সঠিক পয়ঃপ্রয়ালী, বর্জ্যনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। (৬) পানীয় জলের পাইপ, টিউবওয়েলের প্ল্যাটফর্ম সংরক্ষণ যাতে দূষিত জল ইত্যাদির সাথে পানীয় ও ব্যবহারের জলের মিশ্রণ না হয়।

(তিন) টিক সংক্রান্ত এনকেফেলাইটিস :

বিভিন্ন ধরনের রিকেটসিয়া জীবাণু, টিক বা মাইট অর্থাৎ এক ধরনের উকুন বা পোকার কামড়ে বা সংস্পর্শে অথবা তাদের বর্জ্যর সংস্পর্শে এলে নানা ধরনের টাইফাস রোগ (টিক টাইফাস, মিউরিন টাইফাস, স্ক্রাব টাইফাস), নানা ধরনের স্পটেড ফিভার (রকি মাউন্টেন স্পটেড ফিভার, রিকেটসিয়াল পক্স) কিংবা কিউ ফিভার, ট্রেঞ্চ ফিভার ইত্যাদি হতে পারে। ইঁদুর, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি রডেন্ট ও পশু এই রোগের বাহক। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রডেন্ট-পশুর উপস্থিতি এবং তাদের সাথে মেলামেশা, ছোট গৃহে বেশি মানুষ বাস করা প্রভৃতি এই রোগের কারণ। বেশি জ্বর, তারপর কামড় বা সংস্পর্শের জায়গায় দাগ হওয়া এবং তা কোন কোন ক্ষেত্রে সারা শরীরে ছড়িয়ে যাওয়া এই রোগের লক্ষণ। প্রাথমিকভাবে টেট্রাসাইক্লিন আর গুরুতর অবস্থায় ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকে সাধারণভাবে এই রোগগুলি সেরে যায়। কিন্তু চিকিৎসার অভাবে অথবা দেরিতে চিকিৎসা করলে এর থেকে এনকেফেলাইটিস ও মৃত্যু হতে পারে। এই রোগগুলি এড়াতে হলে : (১) সঠিক আবাসন, পয়ঃপ্রণালী ও বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ। (২) পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত স্নান করা ও পরিষ্কার কাপড় পরা। (৩) বেওয়ারিশ কুকুর-বেড়াল নিয়ন্ত্রণ, পশুর খোঁয়াড় মানুষের বাসস্থান থেকে দূরে রাখা ও পরিষ্কার রাখা এবং পশুপাখি ধরলে বা তাদের খাবার দেবার পর ভালো করে সাবান দিয়ে হাত-ধোওয়া। (৪) ভিড় এড়িয়ে চলা। ওয়েল ফেলিক্স রিয়াকশন পরীক্ষা করে এই রোগ নির্ণয় করা হয়। বেনজাইল বেনজোয়েট প্রভৃতি অ্যান্টি মাইট ব্যবহার করা হয়। রোগ হলে দ্রুত হাসপাতালে দেখানো উচিত।

(চার) ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস :

আমাদের দেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্রমণ যাতে বহু শিশু আক্রান্ত হয় এবং দ্রুত ও সার্বিক চিকিৎসা না করালে মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব হতে পারে। হাঁচি, কাশির অর্থাৎ ড্রপলেট ইনফেকশনের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। ব্যাকটেরিয়া জনিত এই

রোগের মধ্যে মেনিনগোকক্কাল মেনিনজাইটিস ও টিউবারকিউলার মেনিনজাইটিস প্রধান। জ্বর, মাথা ব্যাথা, মস্তিষ্কের আবরণীর (মেনিনজেস) প্রদাহ সংক্রান্ত নানাবিধ স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে রোগী ভর্তি হয়। রক্ত ও সি.এস.এফ. পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় সম্ভব। টিউবারকিউলার মেনিনজাইটিসের জন্য অ্যান্টি টিউবারকিউলার থেরাপি এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে ব্রড স্পেকটার্ম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। পাশাপাশি চলে সাপোর্টিভ চিকিৎসা। অনেক ধরনের টিকাও বেরিয়েছে, তবে কোনটাই পুরোপুরি কার্যকর নয়। এই রোগের হাত থেকে বাঁচতে। (১) প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ও যত্ন (২) ভিড়, দূষণ, রোগীর সংস্পর্শ ও সংক্রমণ এড়িয়ে চলা। (৩) বিধি মেনে বিসিজি সহ নিয়মিত ও সময়মত অন্যান্য টিকাকরণ। (৪) রোগ হলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।

একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে যে এই রোগগুলি মারাত্মক হলেও প্রতিরোধযোগ্য। সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিবৃদ্ধি, টিকাকরণ, দ্রুত নির্ণয় ও চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা এদের প্রতিরোধ করতে পারি। বাঁচাতে পারি অমূল্য প্রাণগুলি। প্রতিবেশী চীন, জাপান, উ: কোরিয়া, দ: কোরিয়া, তাইওয়ান, তাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি যদি পারে তাহলে আমরা কেন পারব না?

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০১৭)

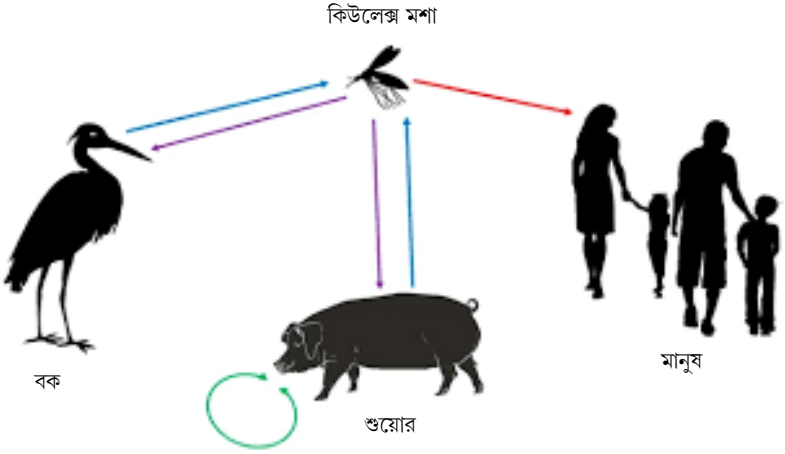

জাপানি এনকেফেলাইটিস ভাইরাসের জীবনচক্র

জাপানী এনকেফেলাইটিস সহ মশাবাহিত রোগকে প্রতিহত করুন

জাপানী এনকেফেলাইটিস একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। ধানক্ষেত, পাট পচা জল, ডোবা, ঝোপঝাড়ে যে মশা জন্মায় সেই মশার কামড়ে এই রোগ হয়। শুয়োর, বক প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যে এই রোগের জীবাণু বৃদ্ধি পায়। এই রোগের লক্ষণ হল ঃ মাথা ব্যাথা, জ্বর, কাঁপুনি, খিঁচুনি, জ্ঞান হারানো ইত্যাদি।

জাপানী এনকেফেলাইটিস সহ অন্যান্য ভাইরাস ঘটিত রোগের প্রতিরোধে যা যা করনীয় ঃ

১) মশারি টাঙ্গিয়ে শোয়া।

২) হাত পা ঢাকা জামা কাপড় পড়া।

৩) ঘরের চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ।

৪) জল জমে থাকলে নালা কেটে বের করে দেওয়া ।

৫) শুয়োর, পাখি, গৃহপালিত পশুর খোঁয়াড় ঘর থেকে দূরে রাখা ।

৬) জ্বর বা অন্য শারীরিক সমস্যা হলে দেরী না করে নিকটবর্তী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালে যোগাযোগ করা ।

দক্ষিণ দিনাজপুরের আউটব্রেকে জনসাধারণের জন্য প্রচারিত

Sankhabela (Saddened Twilight)

Sidhartha Mondal

We initiated an investigation of death of two boys at North Bengal Medical College due to ?Viral encephalitis (as stated in the Death Certificates). The boys were the residents of Bansihari Block of district Dakshin Dinajpur. They had sudden rise of high temperature followed by severe headache, vomiting, convulsion, loss of sensorium, coma and death. They were first taken to Rashidpur Block Primary Health Centre, then were transferred to Gangarampur Sub Divisional Hospital, then Maldah District Hospital and lastly to NBMC&H, Susrutnagar, Siliguri, district Darjeeling. Within 25 hours from the appearance of symptoms they died.

From Balurghat we started early in the morning and our route was through the Hilli - Gazole stretch of the National Highway passing through Gangarampur and Buniadpur. We had a physician, a paediatrician, a health worker and the driver in our team. Later local health officials and health workers and panchyet members joined to our team with another vehicle. From Daulatpur we took a south - east ward village road toward Ganguria GP. Up to Singah village market we could reach by the vehicle. Then we started walking through muddy path. It was drizzling and a pleasant breeze was flowing. The nature was wonderful. Dark clouds partially covered the sky. The villages, mango gardens, palm and date groves were beautiful. The panoramic view of the tender paddy plants was superb. The sun rays were soft, partially hidden, bright and golden which made the endless paddy field ecstatic and simply unnatural.

After few hundred meters walking we encountered a dancing snake couple, both are full grown and large. Actually it was their natural seasonal rhythmic mating which is called 'Sankhalaga' by our companions and the villagers. It is treated as a holy affair in our rural and backward community. I identified them as healthy 'Darash' (Rat Snakes), but local people recognized one 'Darash' and the other as 'Gomo' ('Gokhro' or Monocled Cobra). I saw snake-mating earlier, first at Ganti village of Gaighata Block of North 24 Paraganas in

early '70s and then in Murshidabad and other places. However, from that spot after walking about one kilometer we met a pretty rivulet twisting her waist here and there and hosting some small fishing boats. At a certain point we crossed the over flown rivulet through a friable bamboo-cane bridge. Then we entered into a dense water plant bush taller than a tall adult.

There, after walking around 50 meters we saw the cremation party of one deceased boy. Our team members examined the unfortunate boy. His father, a very reasonable, steady and polite person, described the events. After that, walking a distance we reached to Shantipur village where local health authority had already started a medical camp from a school building. We visited the residence of the first deceased boy whom we had met in the water plant bush and went through his medical records. His bereaved mother and other members of the family were crying loudly. Then we visited the residence of the other boy. His bereaved family did not come out from their rooms and the local people informed us that the boy was buried inside this courtyard near the Tulsitala along all medical records. He was the only son of the family. Receiving a whipping shock we returned.

Then we visited adjacent houses and interacted with the community, examined and treated some patients complaining of fever, malaise and other symptoms, conducted environmental survey, prepared line listing, instilled health and hygiene education, arranged disinfection in the affected houses etc. along with other formalities. The BMOH, the Panchayet Pradhan and we also interacted with the Medical Team.

It was late afternoon, the sun light was faded. Our hearts became heavier. While returning through the same route with the panoramic beauty of the dark green rural Bengal in the rainy season we noticed a wide and prominent rainbow in the eastern horizon. Throughout our journey it showed its saddened face amidst mourning twilight.

[August 2010]

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, জুলাই ২০১২)

AES and the death of our children

Tirthankar Thakur

Till now on 21 June 2019 more than 150 children reported died in this year due to AES (Acute Encephalitis Syndrome) in Muzaffarpur districts of Bihar, the exotic litchi belt, where similar episodes occurred yesteryears. AES is a broad category of fatal diseases transmitted mainly by vector borne viruses and minimally water borne viruses. But some researches brought forward a hypothesis of 'sudden encephalopathy' after eating unripe litchi in empty stomach by malnourished children of poor families who are engaged in litchi farms. According to them sudden and massive hypoglycemia turned shock happened to these children due to an enzyme present in unripe litchi. It is to be mentioned these districts are inhabited by thousands of poor, landless, dalit families having lack of proper and adequate - housing, hygiene, food, safe drinking water, latrine, health facilities, employment, awareness and education and percentage of 'height for age' (48%) and malnutrition (42%) are abysmally high among the children here far above the children of war ravaged Sub - Saharan Countries. The NIV, ICMR; WHO SEARO and other agencies must identify the actual cause and mechanism of prevention quickly and the Governments and we, the citizens, must act promptly. Same types of deaths were reported from the litchi-mango belt of Maldah district, West Bengal.

Few years back more than 200 tribal children died due to AES in Southern Odisha which was later proved due to JE (Japanese Encephalitis), the major component of AES with only two fatal outcomes - death or lifelong disability. And when we were working in North Bengal districts of West Bengal we found death of several children in AES outbreaks in every year. We also found JE - AES is prevalent throughout the Delhi to Sibsagar (Assam) belt epi-centring Gorakhpur (Eastern UP or Purbanchal) and other parts of India. In spite of potent vaccines in hands (once produced by the Government in its Kasauli and Kunnur plants and now imported from China after economic liberization) they were not included in the immunization

schedule of the children in these districts. Then we diagnosed and proved in laboratory that those were JE and since then fought relentlessly for introduction of JE vaccination in the immunization schedule. Later it was included in West Bengal including Kolkata and till now we did not find any major outbreak and casualties.

(Collected)
21.06.2019

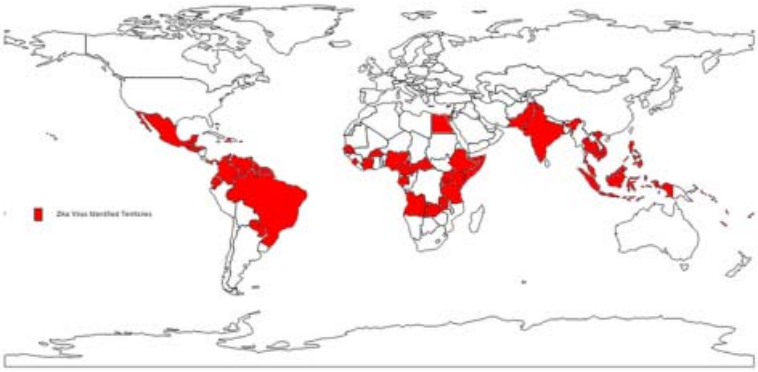

জিকা প্রাদুর্ভাবপূর্ণ অঞ্চল

জিকা রোগীর ছবি

মশক বাহিনী ও জিকা কাহিনী

সমীর রক্ষিত

মশার রকমফের—

- কিউলেক্স মশা : জাপানি এনকেফেলাইটিস, ওয়েষ্টনাইল ফিভার, লিম্ফ্যাটিক ফাইলোরিয়াসিস প্রভৃতি ভাইরাল অথবা নেমাটোডস্ জনিত রোগের কারণ।
- অ্যানোফিলিস মশা : ম্যালেরিয়া প্রভৃতি প্রোটোজোয়াল রোগের কারণ।
- এডিস মশা : ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, জিকা প্রভৃতি ভাইরাল রোগের কারণ। সংক্রমিত এডিস ইজিপটি ও অ্যালবোপিকটাস প্রজাতি দুটি জিকা ভাইরাসের বাহক।

প্রতিবছর—

- ৭০ কোটি সংক্রমণ ও ১০ লক্ষ মৃত্যু ঘটে।
- ৪০ কোটি মানুষ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হন।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই ২০ লক্ষ মানুষ চিকুনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত হন।
- ৫০ হাজার মানুষের, মূলত আফ্রিকায়, পীতজ্বরে (ইয়েলো ফিভার) মৃত্যু হয়।
- ৭০ হাজারের মত মানুষ জাপানি এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হন।
- ২০১৫-তে ২০ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন।
- ২০১৬-র মধ্যে ৪০ লক্ষ মানুষের জিকা রোগ হওয়ার কথা।

জিকা রোগের উৎপত্তি—

- ১৯৪৭ এ আফ্রিকার উগাণ্ডার জিকা জঙ্গলে রেসাস বানরের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়।
- ১৯৫২ তে মানুষের মধ্যে **প্রথম জিকা** রোগ পাওয়া যায়।
- ১৯৬০, '৭০ ও '৮০-র দশকে আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় আউটব্রেক দেখা যায়।
- বিগত কয়েকবছরে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় শুরু হয়ে ২০১৫-র নভেম্বর থেকে মহামারি রূপে ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ডমিনিকান রিপাবলিক, এল সালভাদোর, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, পানামা, প্যারাগুয়ে, সুরিনাম, ভেনেজুয়েলা, পয়ের্তোরিকো প্রভৃতি দেশে ১৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

জিকা রোগের লক্ষণসমূহ—

- জ্বর, র‍্যাশ, গাঁটে ব্যাথা, চোখের পিছনে ব্যাথা, মাংসপেশিতে ব্যাথা, দুর্বলতা, বমি, ডায়রিয়া। সাধারণত প্রতি পাঁচজন আক্রান্তর একজন অসুস্থ হন।
- গুলেন ব্যরি অসুখের (Guillain-Barre Syndrome) মত পায়ে দুর্বলতা, ঝিনঝিন, অসাড়তা প্রভৃতি স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা।
- মাইক্রোসেফালি অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্কের ক্ষতি হওয়া এবং মস্তিষ্কের ও করোটির আয়তন ছোট হয়ে যাওয়া। জড়ভরত সন্তান প্রসব করা।

জিকা রোগ কেন মারাত্মক—

- প্রসূতি অবস্থায় জিকা আক্রান্ত হলে গর্ভস্থ শিশুর জিকায় মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অঙ্গের গঠনগত ত্রুটি (Microcephaly and other birth defects) হওয়ার সম্ভাবনা।

জিকা রোগের কারণ—

- জিকা ভাইরাস যুক্ত এডিস মশার কামড়। এটিই প্রধান রুট।
- যৌন সম্পর্ক : জিকা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌনমিলন। জিকা ভাইরাস রক্তের চাইতে বীর্যে বেশিদিন থাকে এবং বীর্যে ভাইরাস লোড রক্ত ও প্রস্রাবের চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশি। পায়ুসঙ্গমে এবং ওরাল সেক্সেও জিকা রোগ ছড়াতে পারে।
- অযৌন রুট : মা থেকে শিশু, অল্প কিছু ক্ষেত্রে প্রস্রাব, লালা, মায়ের দুধ ও দুর্ঘটনাযুক্ত ছুঁচ ফুটে যাওয়ার কারণে হয়েছে।

জিকার চিকিৎসা—

- চিকিৎসা নেই। প্রতিরোধই ভরসা। পাশাপাশি শরীরের সাধারণ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ানো—সুশৃঙ্খল জীবন, পুষ্টিকর আহার, পর্যাপ্ত ঘুম, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম, নেশা না করা ইত্যাদি।

জিকার প্রতিরোধ—

- লার্ভা দমন : জল জমতে না দেওয়া, জমা জল পাল্টে দেওয়া, লার্ভিসাইড প্রয়োগ।
- প্রাপ্ত বয়স্ক মশা নিধন : ঝোপঝাড়, ড্রেন, ঘরের আনাচ-কানাচ পরিষ্কার, মশা নিধনকারী স্প্রে, ধোঁয়া ইত্যাদির ব্যবহার।

- ব্যক্তি প্রতিরোধ : মশারি, জানালায় নেট, ঢাকা পোশাক, মোজা-জুতো পরা ইত্যাদি।
- নিরাপদ যৌনতা : পুরুষ ও নারী দুজন বা দুজনের একজন জিকা অধ্যুষিত এলাকা থেকে এলে দু'মাস নিরাপদ যৌনতা (কনডোম ব্যবহার, ওরাল সেক্স নয় ইত্যাদি) অনুশীলন। পুরুষসঙ্গীর জিকার উপসর্গ দেখা দিলে ছয় মাস নিরাপদ যৌনতা। সমকামী ও লেসবিয়ান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন বা উভয়সঙ্গী যদি জিকা অধ্যুষিত এলাকার বা এলাকা থেকে আগত হন 'ব্যরিয়ার মেথড' (কনডোম, ফিমেল কনডোম, ডেনটাল ড্যাম প্রভৃতি) ব্যবহার।
- জিকা মহামারি সিঙ্গাপুর অবধি পৌঁছে গেছে। সেখানে ২৯০ জন আক্রান্তের মধ্যে ১৩ জন ভারতীয় ও ২০ জন বাংলাদেশী।

(সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন, অক্টোবর ২০১২)

ডেঙ্গু, জিকা ও চিকুনগুনিয়া সংক্রমণ

অ্যানোফিলিস মশার লার্ভা

The message from the National Center for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC)

Dr. Tinu Jain, The Director

The Vector-borne diseases (VBDs) are a group of communicable diseases transmitted by mosquitoes and other vectors. People suffer from a significant disease burden from these diseases in local and focal areas of India, which is reflected in the form of morbidity and mortality from Malaria, Dengue, Chikungunya, Japanese Encephalitis (JE), Kala-azar and Lymphatic filariasis. The epidemiology of these vector borne diseases varies considerably on account of ecology, vector bionomics, economic, socio-cultural and behavioral factors. Generally, the high risk areas for VBDs are rural and tribal areas and urban slums inhabited by the poor, marginalized and vulnerable groups with limited access to quality health care, communication and other basic amenities in those focal areas.

The National Vector Borne Diseases Control Programme (NCVDCP) is the programme for prevention & control of these vector borne diseases as an integral part of the National Rural Health Mission (NRHM) of India. The NCVBDC envisages a self-sustained and well informed, healthy India free from vector borne diseases with equitable access to quality health care services nearest to their residences. The Programme activities are directed in a way to meet with the Millennium Development Goal of halting and reversing the incidence of malaria and other vector borne diseases by the year 2015 towards reduction of poverty.

The programme aims to make the investments sustainable by developing robust systems and supporting the local capacity. It is planned to ensure that the right diagnostics and treatment are available to all people - especially the poor and disadvantaged living in tribal and rural areas. The GoI has provided cash assistance for engaging Multi-Purpose health Workers (MPW) on contractual basis in high endemic districts for strengthening surveillance, treatment, prevention and control of malaria and other vector borne diseases. Accredited Social Health Activists (ASHA), Anganwadi Workers and MPWs

are trained on the use of RDTs and ACT for malaria diagnosis and treatment at community level. Incentives are given to ASHAs for providing these services.

Significant progress has been made in some states but the progress in a few other states has been uneven, although tender shoots of success are visible. Though the malaria situation has leveled to around 1.5 million cases per year in the past few years, there is immense confidence for future in spite of logistic challenges. The window of opportunity is wide open with availability of effective interventions and increased resource allocations.

Monitoring and evaluation are integral to every aspect of the programme and critical to its success. A new cadre of Malaria Technical Supervisors has been inducted in high endemic areas at sub-district level to strengthen supportive supervision and micro-level monitoring of diagnosis, treatment, prevention and control activities.

In The National Malaria Drug Policy (2010), it has been recommended that the first line of treatment of all P. falciparum cases in the entire country will be Artemisinin-based combination Therapy (ACT). Studies are conducted regularly to monitor therapeutic efficacy through teams at the Regional Offices of Health and Family Welfare and National Institute of Malaria Research. It is very important that the treatment guidelines as given in the article in the present issue of the journal are followed by everyone involved in the treatment of malaria cases so that the development of resistance to the effective drugs are delayed.

Indoor Residual Spraying (IRS) and Insecticide Treated bed Nets (ITN) / Long Lasting Insecticidal Nets (LLIN) are used for vector control in rural areas and anti-larval measures in urban areas. LLINs were introduced in 2009 with supply of 2.57 million nets to people living in high malaria endemic areas and 6.5 million LLINs supplied during 2011. The insecticide policy in different areas is revised based on results of vector susceptibility studies and epidemiological impact of IRS. The use of larvivorous fish for larval control is expanded as an eco-friendly and effective vector control measure.

Sentinel surveillance has been initiated for obtaining information on severe malaria cases and deaths due to malaria, by designating 1 -

2 hospitals in each high endemic district. Detailed investigation on deaths is done with the aim of improving referral and treatment services in problem areas. Provision exists for transfer of severe malaria cases to referral centers with the expenditure borne out of untied funds of the National Rural Health Mission. Early and timely reference of severe cases even by the private providers to the referral centers where such cases are managed will help in reducing the deaths due to malaria.

There is an upsurge noted in the number of cases of some of the arboviral diseases like Dengue and Chikungunya especially in the urban areas of the country. This has happened due to favourable environment available in these areas to the vector Aedes mosquitoes. Effective control of the vector mosquitoes with the help of community support and increased awareness is very important to control the transmission of these diseases. The role of both private and public sector healthcare providers in these areas is very important to increase the awareness in the community and motivating the people for reducing the breeding sources of the vector. A network of 769 Sentinel surveillance hospitals and 17 Apex Referral Laboratories with advanced facilities located in 35 States/UTs for diagnosis of Dengue and Chikungunya has been established in the country where antigen and both antibody-based case detection kits are available.

Japanese Encephalitis (JE) outbreaks have been reported from different parts of the country periodically. These outbreaks are usually circumscribed and do not cover large areas. They usually do not last more than a couple of months. The involvement of private providers in motivating the community for vaccination in the specific areas against JE and in preventive actions will help to reduce its transmission.

Kala-azar elimination project is being implemented in four endemic States namely Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and West Bengal with introduction of Rapid Diagnostic Test for diagnosis and oral drug Miltefosin for treatment. The private providers can use this facility to diagnose their cases through the nearest PHCs and help in ensuring treatment compliance by getting involved through various partnership schemes and thus contributing in achieving the elimination of Kala-azar.

The strategy for achieving the goal of elimination of filariasis is by annual Mass Drug Administration of anti-filarial drugs (DEC+Albendazole) for 5 years or more to the population excluding children below two years, pregnant women and seriously ill persons in affected areas to interrupt transmission of disease. Home based management of cases of lymphoedema (elephantiasis) is encouraged under this. Hydrocelectomy operations in identified CHCs and hospitals are also done under the programme. The private providers can play an important role in this endeavour by referring the cases to avail those services and also motivate the community during MDA.

Malaria control activities are intensified in high endemic states with special projects. The strategies include early diagnosis and complete treatment, integrated vector management and other supportive interventions including training, and behavior change communication. The use of Rapid diagnostic tests (RDT) for diagnosis of cases has been scaled up in the country for early diagnosis of P. falciparum malaria in difficult-to-reach areas where microscopy results cannot be made available within 24 hours of taking blood smears. About 10 million RDTs are used annually by the programme.

I am happy to see that there is a renewed commitment for collaboration to improve the lives of those we are privileged to serve. The programme is constantly promoting partnership with NGOs, private sector including industry, Faith Based Organizations, Community Based Organizations and Panchayat / Village Councils / Tribal Councils. Necessary information is being shared with all partners to facilitate system strengthening and quality enhancement. Through these efforts, access to services and support can be provided to people in isolated and vulnerable areas. We also look forward to the participation of Medical Colleges to function as sentinel sites as well as in operational research activities for which NCVBDC has supported NIHFW to organize training of faculty of medical colleges (community medicine, pediatrics, medicine and microbiology) during 2011.

There is a constant threat of malaria and other vector borne diseases for spread into new areas as a result of climate change and environmental factors. In these days, with inter-state travel as common

as travel between adjacent villages was, a generation ago, dispersal of the malarial parasites from endemic areas to non-endemic areas, particularly to cities and towns has become common. Now is the time to focus on what has to be achieved - to scale up and produce results; to roll back malaria, its threats and suffering. We are now more determined than ever to achieve the ultimate goal of eliminating malaria and other VBDs from India.

The focus of India's malaria control strategies is not only on techno-managerial aspects but also on the socio-economic-cultural context. Behvaiour Change Communication (BCC) activities are aimed at generating awareness that would enable and empower the people to access and utilize available services and actively participate in the decision making processes. Anti Malaria Month is observed in the month of June every year with enhanced campaigning prior to the peak malaria transmission season.

Improving health outcomes is a shared responsibility. It is intended to pursue VBD control strategies through actions which involve all sections of society and all sectors. By doing so, we could serve as engines of change that would demonstrate what is possible when the right ideas, policies and resources come together. This requires an alignment of people and forces that share a mutual commitment.

It is estimated that the private sector account for around 80% share of all health care delivered in India and this share is increasing rapidly. We urge the private practitioners to join as strongly as possible in the government's fight against malaria. We request the practitioners to adopt diagnostic and treatment practices which are consistent with the national guidelines. Incorrect schedules based on patient's demands and sub-therapeutic regimens can lead to emergence and spread of drug resistant strains of malarial parasites. We also appeal to the practitioners to educate the community on methods of preventing malaria and protecting oneself from mosquito bites. Together as partners we have an opportunity to contribute to effective programme implementation and impact. The programme conducts training not only for government personnel but also for private practitioners to sensitize them about the policy and strategies for VBD control.

In spite of some spectacular successes against malaria, we are still far from attaining freedom from malaria. It is not acceptable to consider that malaria is part of the misery of being poor. Our control strategies have the potential to substantially reduce the malaria burden, breaking the cycle of infection, disease and lost opportunities that keep people in poverty. Much more remains to be done, and the road ahead may not be easier than the one already traveled.

The Global Fund (GFATM) and the World Bank are the major partners supporting the NCVBDC for its specific activities in focal areas for malaria control and kala- azar elimination in the most endemic districts affecting the poorest of the poor residing in inadequate and unhygienic housing. WHO is another important partner providing technical support and assistance to the programme in various forms.

The website of NCVBDC is an effort to meet those challenges. It is an effort to communicate the learned readers of this site about the activities undertaken by the NCVBDC and current status and issues related the VBDs. I hope that it will be useful to the readers in the provision of their healthcare services. It is requested to the healthcare providers in the private sector to adopt the current drug policy for the treatment of the malaria cases treated by them. Various Public -private partnership schemes are also there to involve the private providers, the information of which can be available from the State/district authorities. The combined efforts of all will help us to achieve our goals for controlling VBDs.

(Collected)

মশা বিরোধী অভিযান

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-২ (নব পর্যায়)

মশা বাহিত কয়েকটি মারাত্মক রোগ: ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জাপানি এনকেফেলাইটিস ও জিকা

- সময়মত চিকিৎসা না করলে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া ও গুরুতর ডেঙ্গু রোগে প্রাণ সংশয় হতে পারে
- জাপানি এনকেফেলাইটিস মারণঘাতী রোগ; শিশুদের এই রোগের টিকা দিন
- এই রোগগুলির বাহক মশাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সমবেতভাবে সমগ্র এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখুন, জল জমতে দেবেন না, কোথাও জল রাখার প্রয়োজন হলে ঢাকা দিন এবং/অথবা সাতদিনে একবার জমা জল পাল্টে ফেলুন
- বাড়ির চারপাশ, ছাদ, ড্রেন এবং বাড়ির মধ্যেটা পরিষ্কার রাখুন; কোথাও জল জমতে দেবেন না। জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার ও ঢেকে রাখুন
- এলাকার জলাশয়গুলি সংস্কার ও সংরক্ষণ করুন; মশার লার্ভাভুক গাপ্পি ও গাম্বুসিয়া মাছ ছাড়ুন
- দিনে ও রাতে ঘুমোনোর সময় মশারি ব্যবহার করুন
- ঘরের বাইরে সুতির ফুলশার্ট, ফুলপ্যান্ট, মোজা এবং ঢাকা জুতো ব্যবহার করুন। মহিলাদেরও ঢাকা পোশাক এবং ঢাকা জুতো-মোজা পরা উচিত
- ঘরের মধ্যেও সুতির ঢাকা পোশাক পরুন
- জ্বর হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেখান ও রক্ত পরীক্ষা করান

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের পক্ষ থেকে অরণি সেন কর্তৃক প্রকাশিত
যোগাযোগ: ssunnayan@gmail.com • ওয়েবসাইট: www.ssu2011.com
বিনিময় : ৬০ টাকা